উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬/১-এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

"একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী অপর পক্ষে, বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্যপ্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

"এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে! এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯
পৃঃ ৫৪১-৫৪২)

ভূমিকা

স্বদেশী যুগকে আমি বাংলার পুনর্জন্ম বা Rebirth লাভের যুগ বলিয়া মনে করি। এই যুগে বাঙালী বহু শতাব্দীর পরাধীনতাজনিত গ্লানি মুছাইবার জন্য পুনঃ আত্ম-সচেতন (self-conscious) হয়। বাঙালী নিজের ঐতিহ্য খুঁজিতে থাকে। চারিদিক থেকে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। বারভূঁইয়াদের ইতিহাস, মল্লভূমির কৃষ্টির ইতিহাস, সীতারামের ইতিহাস, শোভা সিংহ বা বাগ্‌দী বিদ্রোহের ইতিহাস চারিদিক থেকে উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। বাঙালী দেখিল তাহার একটি অতীত ইতিহাস আছে। একদিন কুমারটুলীর এক স্বদেশী সভায় চিত্তরঞ্জন দাস একটি কবিতা পড়িলেন। তার দুই লাইন এখনও মনে আছে :

> "বাঙালীর আছে ইতিহাস
> বাঙালীর আছে ভবিষ্যৎ।"

তখনও আজকালকার ultra-radical critics-এর দল উদিত হয় নাই—যাঁহারা পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কিছুই মানিবেন না।

এই সময় ছিল ত্যাগের যুগ। চারিদিক থেকে ত্যাগের সংবাদ আসিতে থাকে। একদিন 'পান্তীর মাঠে'র মিটিং-এ সুবোধচন্দ্র মল্লিক ঘোষণা করিলেন যে, তিনি জাতীয় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিতেছেন। তার কয়েকদিন পরেই এই স্থলে ঘোষিত হইল যে, গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন। তারপর শোনা গেল ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিতেছেন।

তৎপর অরবিন্দ ঘোষ ৭৫০৲ টাকা মাহিনার চাকুরী ছাড়িয়া বরোদা হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজে সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া দীনভাবে জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় ঘোষণা করা হইল যে রাধাকুমুদ মুখার্জী ও বিনয় সরকারের হাত দিয়া কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে ৩০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তারপর শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজের অধ্যাপনা (সরকারী চাকুরী) ছাড়িয়া স্বদেশী কর্মে প্রবেশ করিলেন। পুনঃ, এই সময় ছোট অরবিন্দ ঘোষও হেয়ার স্কুলের মাষ্টারী ছাড়িয়া দেন ও স্বদেশী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ অপরাপর ব্যক্তির চেয়ে বড় মনে করি। কারণ তিনি নির্ধন লোক ছিলেন ও তাঁহার পোষ্য ছিল অনেকগুলি। খুব বেশী মনের জোর না থাকিলে তাঁহার মত ব্যক্তি সরকারী চাকুরী ছাড়িতে পারিতেন না।

পূর্ববঙ্গে গমন করিলে দেখি সর্বত্রই নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা। কিশোরগঞ্জে গমন করিলে সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি পূর্বেকার ভাল চাকুরী ছাড়িয়া তথাকার জাতীয় বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করিতেন। তিনি যখন গ্রামাঞ্চলে স্বদেশী বক্তৃতায় বাহির হইতেন, এবং বক্তৃতার পর লোকেরা যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়া স্বদেশী স্কুলের জন্য সাহায্য সংগ্রহে বাহির হইতেন, তখন মহিলারা স্বর্ণ গহনাদি দান করিতেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের কার্য-কলাপ ছিল অতুলনীয়। পূর্ববঙ্গে "ভাট্" বলিয়া একটি জাতি পূর্বে ছিল। তাহারা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারাও প্রকাশ্যে বাহির হইয়া স্বদেশী গান গাহিতে লাগিল। সর্বত্রই ত্যাগের কথা এবং

স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্যোগের কথা আলোচিত হইতে থাকে। সেই সময় নির্ভীক জানবাজ দেশসেবক তরুণেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মাতৃজাতির সর্বস্তরেব মহিলাদের বলিষ্ঠ মনোভাব ও ত্যাগের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সুরু হয়, তখন শোনা গেল, ময়মনসিংহের যুবদলের নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ও জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তের বাড়ীতে গুণ্ডারা আক্রমণ করিবে। এই গুজব শুনিয়া মুক্তাগাছা থেকে জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া হেমেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গকে মুক্তাগাছায় লইয়া যাইতে আসেন (লেখক এই সময়ে হেমেন্দ্রবাবুর অতিথিরূপে তথায় ছিলেন)। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুর মা ও মাতামহী প্রভৃতি উত্তর দিলেন: "আমরা বড়লোক, আমাদের নিরাপদ স্থানে যাবার জায়গা আছে। কিন্তু এপাড়ার গরীবদের কি দশা হবে? তাদেরও যে দশা হবে, আমাদেরও সেই দশা হবে। আমরা যাব না।"

কালীপ্রসন্নবাবুর পরিবারবর্গকেও তাঁহার বন্ধুরা এই প্রকারের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও উপরোক্ত প্রকারের উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেখবার বন্ধুরা আছেন, কিন্তু পাড়ার গরীবদের কি দশা হবে? তাদের যে দশা হবে, আমাদেরও সেই দশা হবে। আমরা যাব না।"

পুনঃ, বরিশালের এক তরুণীর "বেণী-বাঁধা পণ" তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আবার সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, আমাদের বাঙ্গলার বর্ষীয়সী মহিলারাও (dames) দেশের কার্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি লেখকের জননীর

উক্তি উদ্ধৃত করেন—"আমি ভূপেনকে দেশের কার্যের জন্য উৎসর্গ করিলাম।"

পুনঃ, তখন রংপুর, ময়মনসিংহ ও আরও অনেকস্থলে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত affiliated হইয়া কার্য চালাইতে থাকে। তখন বাঙালী নেতৃবর্গের সঙ্কল্প হইয়াছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। এই সময় আবার National Medical Schoolও প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশী শিল্পও এই সময় প্রসার লাভ করিতে থাকে। কেউ কেউ একথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা ভারতের স্বাধীনতা আনিয়া দিব। এই সময় মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাও লোকেরা অভিনয় করিতে লাগিল। গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির পক্ষ থেকে এই সময় "স্বদেশী রামায়ণ" রচিত হয় এবং তাহা বিভিন্ন স্থানে তৎকালে পঠিত হইত। ইহার গুটিকতক গানের নমুনা দিতেছি :

"একবার এস ফিরে ফিরে এস গো,
একবার পূর্বাকাশে মধুহাসি হাস গো।
এসেছিলে শুনি কানে কবে হায় কেবা জানে,
কখন কদাচ গানে ভাস গো।
বহুদিন হলো প্রাণ, বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হবে মা তোর আবাহন গান।
তথাপি শঙ্করী এস, ভগ্নহৃদয়ে বস,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো।"

এইটি ছিল দুর্গার আগমনী গান। এই আগমনী গানটি যেন বাংলার অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই গানটি একদিকে

যেমন বাংলার বিস্মৃত অতীতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে নূতন যুগের প্রতিও ইঙ্গিত করিতেছে।

তৎপর, পূজার সময় বানরেরা যখন দেবীমূর্তি দেখিতে যায়, তখন সিংহবাহিনী মূর্তি দেখিয়া তাহারা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল :

'সিংহের দাপটে প্রাণ যায় মা,

* * *

কোথা হতে বিকট পশু
দেখে সে ভয় পায় মা।
পশুরাজ সিংহ বটে
তুমি যে চরণ দিয়েছ পিঠে।" ইত্যাদি

ইহার পর রাবণ যুদ্ধ করিবার জন্য স্বদেশবাসীদের আহ্বান করিলেন :

"স্বদেশের ধুলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।"

* * *

"কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁরি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন
নিজ দেহপ্রাণ দিয়ে বিসর্জন
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন (বন্ধন-মোচন)
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

এই রামায়ণ কথকতা তৎকালে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাড়ীতে পঠিত হইত। এই কথকতা যখন ময়মনসিংহের জমিদার জগৎকিশোর

আচার্য চৌধুরীর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন উপরোক্ত গান—"সিংহের দাপটে প্রাণ যায় মা" শুনে জগৎকিশোরবাবু হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ সকলের কাছেই প্রাঞ্জল। এই সময় দেবব্রত বসুও (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) অনেক স্বদেশী গান রচনা করেন। সেগুলি তখন সর্বত্র গীত হইত। এই গানগুলির মধ্যে একটি গান ছিল যথা ঃ

"কে আছ দাঁড়ায়ে নীরবে,
কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে।
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল,
বাড়ায়েছ মার যাতনা কেবল,
(ওরে) মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্বল সবল সেও কি ভাবিবে!
কে আছ বিদেশী পরপদসেবী,
গোপনে মাতৃভূমি সেবক সন্ধানে।
এসো শীঘ্র এসো'বেলা বয়ে যায়
জাপান এনেছে ঊষা এশিয়ায়।
মধ্যাহ্ন-গরিমা স্বাধীন ভারত
আনিবে নিশ্চয়ই আনিবে।"

এই সময় নানা দেশপ্রেমমূলক নাটকও রচিত এবং অভিনীত হইতে থাকে।' ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য" নাটক খুবই যুগোপযোগী হইয়াছিল। এই নাটকের একটি গান,

"এখনও তরীতে আছে স্থান,
উঠে এসো ছুটে এসো
এই বেলা উঠে বসো,
জীবন করো না অবসান।" ইত্যাদি

এই গানটিতে বৈপ্লবিক কর্মীরা মনে করিলেন যে এতদ্বারা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য জনগণকে আহ্বান করা হইতেছে।

এই সময় তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গানও যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল। শ্রীমতী কামিনী রায়ের সঙ্গীতও তখন জনপ্রিয় ছিল। এই সময় স্বদেশী গান প্রচার করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতায় "স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়" নামে একটি দলও গঠিত হইয়াছিল। ঐ সমিতি হইতে তৎকালে "স্বদেশ সঙ্গীত" নামে একখানি সঙ্গীত পুস্তকও প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে তৎকালের জনপ্রিয় অনেক কবির অনেক স্বদেশপ্রেমমূলক গান মুদ্রিত আছে। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কবি কামিনী কুমার ভট্টাচার্যের নামোল্লেখও দরকার। তাঁহার রচিত

"শাসন সংযত কণ্ঠ জননী
গাহিতে পারি না গান ;"

—এই সঙ্গীতটি তৎকালে সর্বত্র গীত হইত। তাছাড়া, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষও (যিনি বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) কয়েকটি ভাল গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "পল্লীবিলাপ" নামক কবিতা-পুস্তক তখন লোকসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহার একটি বৃহৎ স্বদেশী গান :—

"বাসন্তী চন্দ্রিমা পূর্ণ সারা ভূমণ্ডল,
আমাদের জীর্ণ গৃহে শুধু অন্ধকার।" ইত্যাদি

পরিশেষে, কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও দুচার কথা বলিতে চাই। তাঁহার রচিত "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" এই মন-মাতানো গানটি সর্বত্র গীত হইত। এই গানটি সর্বপ্রথমে কলিকাতার Town Hall-এ গীত হয়। ঐ সভায় তাঁহার দ্বিতীয়বার "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর তিনি এই গান গাহিতে

থাকিলে সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ কবির সঙ্গে সুর দিয়া গানটি গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন। এই গান এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে তৎকালে Star Theatre-এর রঙ্গমঞ্চেও এই সঙ্গীত গীত হইত। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম পঠিত হইয়াছিল। ঐ সভায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আসিয়া লোকের ভীড় সংযত করে। আমি নিজে ঐ সভাতে যাই নাই, তবে তৎকালেই অনেক শ্রোতার মুখে শুনিয়াছিলাম যে ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে Armenian Revolutionaryদের মত জীবনের সর্ব কর্মে নিজেদের স্বায়ত্তাধীন হইতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা-দিগকে Passive Resistance বা নিরস্ত্র প্রতিরোধনীতি গ্রহণ করিতে বলেন। হালে মুদ্রিত "স্বদেশী সমাজ" পুস্তকে এইসব কথা আর দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তৎকালে আরও অনেক প্রাণ-মাতানো স্বদেশী গান রচনা করিয়াছিলেন।

এই সকল জাতীয় গানের মধ্য দিয়া তখনকার লোকের temper বা মেজাজ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তৎকালের সাহিত্যে একটা নূতন সুর (new tone) ধ্বনিত হইতে থাকে। পূর্বযুগের হতাশার সুর, নৈরাশ্যের ভাব—যা আগেকার কবিদের নিকট হইতে শুনিয়াছি—তাহা অন্তর্হিত হয়। "যুগান্তর", "সন্ধ্যা" প্রভৃতি পত্রে স্বাধীনতার নূতন সুর ব্যক্ত হইতে লাগিল। "যুগান্তর" পত্রিকার মূল নীতিই ছিল, হায় হায় রব তুলিয়া বুক চাপড়াইয়া স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিব না। বরং Constructive Programme দিয়া দেশকে কি করিয়া স্বাধীন করিতে হয় তাহার পথ প্রদর্শন করিব। প্রথম হইতেই "যুগান্তর" পত্রিকার tone

বা সুর অতি গুরুগম্ভীর ছিল। ইহার সুর "সন্ধ্যা" পত্রিকা অপেক্ষাও চড়া ছিল। এই স্থলে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

উপাধ্যায়জী আজও আমাদের দেশে misunderstood হইয়া আছেন। তিনি বাড়ুজ্যে বংশে শ্রীরাম ঠাকুরের সন্তান। তরুণ বয়সে তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপর আবার খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়া রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হন ও গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন কাটাইতে থাকেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য আচার পালন করেন। তিনি নিরামিষাশী ও ছুঁৎমার্গী ছিলেন। মধ্যবয়সে তাঁহার প্রবল ঝোঁক হইল বেদান্তের উপর খৃষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইজন্য তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী হইতে excommunicated হন। তৎপর তিনি ইংলণ্ড গিয়া বেদান্ত প্রচারে যত্নবান হন। অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত দর্শন পড়াইবার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐ পরিকল্পনা (scheme) কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা সফল হইল না।

তৎপর, ১৯০৪ সনে উপাধ্যায়জী কয়েকজন অনুরাগী বন্ধুর অর্থানুকূল্যে "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রথম দিকে এই পত্রিকাতে কোন violent political turn পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইলে "সন্ধ্যা" পত্রিকা ক্রমে ক্রমে উগ্রপন্থী হইতে থাকে। তখন তিনি পুরাপুরি জাতীয়তাবাদী। কিন্তু একদল লোক তখনও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না। তাহারা তাঁহাকে Jesuit (অর্থাৎ মনে এক

মুখে আরেক) ভাবিত। বোধ হয় এই কারণে এবং জাতীয়তা-বাদের urge-এ বা ধাক্কায় তিনি পরিশেষে "মিতাক্ষরা" মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দু হইলেন। তাঁহার খৃষ্টান শিষ্য রেবাচাঁদ বলেন, ৺পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপাধ্যায়জীকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়াছিলেন। শেষে "সন্ধ্যা" মামলা স্থুরু হইলে উপাধ্যায়জী Campbell Medical Hospital-এ অস্ত্রোপচার করিতে যান ও সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। বন্ধুরা গিয়া তাঁহার শব লইবার পূর্বেই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁহার শব রাস্তায় রৌদ্রে রাখিয়া দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর এমনি নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছিল। তৎপর গুণগ্রাহীরা গিয়া তাঁহার শব লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া নিমতলা ঘাটে গমন করেন ও সেখানকার শ্মশানে তাঁহাকে দাহ করা হয়। কথিত আছে, আনুমানিক দশ হাজার লোক এই শবানুগমন করিয়াছিল। তৎপর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্ররা কালীঘাটে হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

আমার ধারণা জাতীয়তাবাদের আবেগই উপধ্যায়জীকে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে ঠেলিয়া দিয়াছিল। ইউরোপের ইতিহাসেও এইরকম দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়—যেমন স্পেনদেশীয় সিডের (Cid) জীবনে দেখিতে পাই। জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় তিনি মুসলমান ধর্ম হইতে আবার খৃষ্টান ধর্মে ফিরিয়া আসেন (Hitti—*History of the Arabs* দ্রষ্টব্য)। আলবেনিয়ার স্কান্দারবেগ জাতীয়তাবাদ-প্রণোদিত হইয়া তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে শেষে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া জর্জ ইশকারিওটা (George Iskariota) হইলেন। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

উপাধ্যায়জীর "সন্ধ্যা" পত্রিকা স্বদেশী যুগে বিশেষ কার্যকরী

হইয়াছিল। দোকানী-পশারী ও সাধারণ লোকদের পাঠোপোযোগী বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বদেশবাসীকে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। "সন্ধ্যা" পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত নরমপন্থীয় রাজনীতিক মতবাদকে খণ্ডন করা। ফিরিঙ্গি গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার বাড়িতে থাকিলে এই পত্রিকা ক্রমে ক্রমে ভীষণ উগ্রপন্থী হইয়া উঠে। এতদ্বারা জনসাধারণের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিক দলের "যুগান্তর" পত্রিকা বাহির হইবার পূর্বেই "সন্ধ্যা" পত্রিকা বাংলা দেশে আসর জমাইয়া বসিয়াছিল। "সন্ধ্যা"র সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া "যুগান্তর" পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আরও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল। "যুগান্তরে"র সুর এত চড়া ছিল যে তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই। শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান হরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে তৎকালে "যুগান্তর" পত্রিকাকেই বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়ের চোখে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। ভ্যালেনটাইন চিরোলের *Indian Unrest* গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

"যুগান্তর" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা একখানি নূতন দৈনিক পত্র বাহির করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এইকথা শুনিয়া উপাধ্যায়জী আমাকে বলিলেন, "মনোরঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে বল্‌লাম যে নূতন কাগজ বের করবার এখন আর দরকার নেই। 'যুগান্তরে'র আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাঁকে বল্‌লাম যেন উনি তোমাদের 'যুগান্তর' পত্রিকাকেই সাহায্য করেন। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।" মনোরঞ্জনবাবু আমাকে বলিলেন, " 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরের' মাঝামাঝি

একটা কাগজ দরকার। আমার কিছু নূতন বক্তব্য আছে।" ১৯০৭ সনের মধ্যভাগে তাঁহার "নবশক্তি" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু "নবশক্তি"র সুর "যুগান্তর"কে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না, তাই ইহা তেমন জনপ্রিয়তাও লাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে "যুগান্তর" দলই এই কাগজ সম্পাদনা ও পরিচালনা করিত।

উপাধ্যায়জীর সঙ্গে একবার তাঁহার "সন্ধ্যা" আফিসে জাতীয়তা বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি আমাকে বলিলেন, "উহাদের (ইংরেজদের) আকৃতির উপর ঘৃণা উৎপাদন কর। আমাদের রূপের আদর্শ কি সুন্দর! কি দুধে-আলতার গায়ের রং, কালো চোখ, কালো চুল ইত্যাদি।" এতদ্বারা তিনি আজকালকার Nordicism বা উত্তর ইউরোপীয় মূলজাতি (Race) গত আদর্শের (কটা চুল, নীল চক্ষু ইত্যাদির) বিপক্ষে আমাদের শারীরিক আকৃতির (দুধে-আলতা গাত্রবর্ণ, কালো চুল প্রভৃতির) প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাহিতেন। এইরূপ একটি প্রবন্ধও তিনি তাঁহার কাগজে একবার লিখেন।

এতদ্বারা উপাধ্যায়জী ইংরেজ ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদীয় মূলমন্ত্র Nordic Race Superiority-র প্রতি প্রত্যাঘাত করিতে চাহিতেন। পুনঃ, তাঁহার রাজনৈতিক মনোভাব নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ পীড়িত হয়ে দেওঘরে তাঁহার মামার বাড়ীতে ছিলেন। "যুগান্তর" সম্পর্কীয় কার্যের জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়। শ্রীকেশবচন্দ্র সেনগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া আমি তথায় রওনা হই। তথায় চারি দিন থাকি। সেই সময়ে বারীন্দ্র ঘোষও তথায় ছিলেন। তিনি একখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত বই আমায় পড়িতে দেন। এই পুস্তকের নাম Quo Vadis। পোলীয় স্বদেশপ্রেমিক সিনকিভিট্‌জ্

(Sincievitz) দ্বারা রুষ-জারের অত্যাচারের কথাই রোম-সম্রাট নিরো দ্বারা খৃষ্টানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। পুনঃ, বারীনবাবু বলিলেন, গ্রন্থকার তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার (Prof. M. Ghose-এর) বন্ধু। এই পুস্তকে কি প্রকারে প্রাচীন খৃষ্টানেরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) দ্বারা রোম-সম্রাটের অত্যাচার প্রতিহত করিত তাহাই বর্ণিত আছে। আসলে, এই পুস্তকে রূপকভাবে পোলীয় দেশপ্রেমিকেরা রুষ-সম্রাটের অত্যাচার কিরূপে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিহত করিত তাহারই বর্ণনা আছে। আমি এই পুস্তক পড়িয়া উৎসাহান্বিত হই। কলিকাতায় ফিরিয়া আমি উপাধ্যায়জীকে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মতবাদের কথা বলি। তিনি উত্তর দিলেন, "উহাতে আমাদের হবে না।" শুনিয়া মনটা দমিয়া গেল। কিন্তু তৎকালে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় Passive Resistance অবলম্বন করিবার জন্য বক্তৃতা করিতেন। পরে, আবার ১৯২০-২১ সন হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের "ভারত ছাড়ো" (Quit India) আন্দোলন পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস এই পন্থাই স্বাধীনতা লাভের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

আমার ধারণা জাতীয়তাবাদের ভাবে উপাধ্যায়জী এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আর্যকৃষ্টির উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পুনরুদয় হয়। একবার কালীঘাটের কালীমন্দির দর্শন করে ফিরে এসে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "আমি দেখলুম মা হাসছেন।" এই ঘটনাটি তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করার পূর্বেকার ঘটনা বলিয়া মনে হয়। আমি উপাধ্যায়জীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠি এই মনে করে যে, তাঁহার ব্রাহ্ম-খৃষ্টান মানসিক পটভূমি হইতে কিরূপে এই কথা বাহির হইতে পারে! তিনি বলিলেন, "ইহা সত্য।" এই সময়েই তিনি

আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "আমি কখনও যীশুকে অবতার বলি নাই।" ইহা আমার কাছে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইল। কারণ ত্রিত্ববাদীয় খৃষ্টান ধর্মের Athenesian Creed-এর আসল ভিত্তি হইতেছে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র—যিনি মানবকে ত্রাণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এই খৃষ্টানধর্ম তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির সম্মুখে এক সময়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি।

প্রায়শ্চিত্তের পর, একদিন বিডন স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভায় বক্তৃতাকালে উপাধ্যায়জী বলিয়াছিলেন, "আমি আবার জন্মাব, আবার এই দেশে আসব, আবার দেশের জন্য কার্য করিব।" এই সব উক্তি তাঁহার স্বদেশীভাবে তন্ময়তার লক্ষণ। এই সব উক্তি ধর্মীয় Dogma-র বাহিরে। ইহা প্রাণের গভীরতম স্তর হইতে দেশভক্তির উচ্ছ্বাসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

দেশকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টা ছিল উপাধ্যায়জীর জীবনের শেষ সাধনা। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব কৃতী হিন্দুসন্তান খৃষ্টান-ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, দেশকে জগতের সামনে উচ্চাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "আমরা হিন্দুধর্মকে সংস্কার করিতে চাই।"

ইংরেজী সভ্যতা ও কৃষ্টি এ দেশে প্রচারিত হইলে লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তৎপরে, ইংরেজ পাদ্রীরা নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খৃষ্টান ধর্মের সহিত একীভূত করিয়া নিজেদের সভ্যতা ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে থাকেন। কাজেই স্বীয় ধর্ম ও স্বীয় জাতির দৈন্য দেখিয়া উন্নতির উপায়স্বরূপ অনেক হিন্দুসন্তানই তৎকালে খৃষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। সাধু নেহেমিয়া নীলকান্ত

গোরে, সাধু সুন্দরলাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তি প্রকৃত দেশ-হিতৈষী, জাতীয়, ভারতীয় সাধু ছিলেন। আমরা তৎকালীন এই মনস্তত্ত্ব যেন অনুধাবন করে এই সব মহান ব্যক্তিদের বিচার করি।

উপাধ্যায়জীর সহিত আমার সম্বন্ধের যবনিকা পতন হইল যখন আমি জেলে যাইবার দিন সকালে তাঁহার কাছ হইতে বিদায় নিতে যাই। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আমায় দেখে সাশ্রু-নয়নে বলিলেন, "তুমি জেলে যাবে, আর আমি ঘরে বসে থাকব!"

শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান হরিদাস মুখোপাধ্যায় বর্তমানে "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" নামক তাঁহাদের গবেষণা গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। উপাধ্যায়জীর জীবন সম্বন্ধে কম লোকই পুরা ওয়াকিবহাল আছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহার জীবনের কেবল শেষভাগেই দেখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত বাজারে প্রকাশ হওয়া সম্ভব। কিন্তু মুখোপাধ্যায়দ্বয় "পাথুরে প্রমাণ"রূপ নিশ্চিত তথ্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া উপাধ্যায়-জীর সমগ্র জীবনকথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যথাযথ ইতিবৃত্ত তাঁহারা যে নিপুণভাবে উদ্ধার করিয়াছেন, সেজন্য ভবিষ্যদ্বাসিগণ তাঁহাদের নিকট নিশ্চয়ই চিরঋণী থাকিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের লেখা উপাধ্যায়জী বিষয়ক এই মূল্যবান গ্রন্থখানিও পণ্ডিত সমাজে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে। ইতি—

৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬১

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রস্তাবনা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙালীর অপূর্ব ত্যাগ ও সাধনা অবিস্মরণীয়। বাংলার অপরাজেয় যৌবনশক্তিই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নিশিখাতেই একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের স্বরাজ-সাধনা হ'য়ে উঠেছিল প্রদীপ্ত। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলো, আর তার জন্যে বাঙালীকে বরণ করতে হলো দধীচির মত চরম আত্মত্যাগ।

রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-দেশবন্ধু-নেতাজী ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা আজ শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্য হ'তে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত। বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে যে-বাংলা ছিল ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে বৃহত্তম এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-চেতনায় ছিল সর্বাগ্রগণ্য, আজ তার ভৌগোলিক আয়তন হয়েছে বেদনাদায়করূপে সঙ্কুচিত—তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বও প্রায় অবলুপ্ত। আজ চারিদিক হ'তে দুর্দিনের ঘনান্ধকার নেমে এসেছে। ভারতরাষ্ট্রে বাঙালী আজ প্রবাসীর মতো, তার মানবিক অধিকার ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ বাঙালী আজ বাস্তহারা—লক্ষীছাড়া। অহিংসধর্মী কল্যাণ-রাষ্ট্রে আরম্ভ হয়েছে বর্বরতার উন্মত্ত অভিযান। এই অন্ধ উন্মত্ত বর্বরতার গতিরোধ করতে না পারলে পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালীর বিলুপ্তি অনিবার্য।

স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসক একদিন বাঙালীর গর্বিত দেশপ্রেম ও শুভ-বুদ্ধিকে আহত ও অপমানিত করে যে দাবানল জ্বালিয়েছিল, তাকে সেদিনকার বাঙালী অসহায় হতাশার সঙ্গে স্বীকার করে নেয় নি, রুখে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে—প্রাণ দিয়ে বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার উদ্ধত গতিকে প্রতিরোধ করেছিল। তারই ফলে শেষ প'স্ত ইংরেজকে বিদায় নিতে হলো ভারতের মাটি থেকে। স্বদেশী যুগে সংগ্রামী বাঙালীকে লক্ষ্য করে গোখ্‌লে ঠিকই বলেছিলেন যে, বাঙালী ক্ষতি স্বীকার করতেও প্রস্তুত কিন্তু সে অপমান বরদাস্ত করতে পারে না।

অনেক দিন পরে ঘন তমিস্র ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছে উদ্দীপ্ত আলোকের আহ্বান। সংগ্রামী বাঙালী আবার জেগে উঠ্‌ছে; আজ আবার ভারতের পূর্ব দিগন্তে সংঘবদ্ধ অত্যাচার, অবিচার ও অবমাননার বিরুদ্ধে বাঙালী তার মহৎ মানবিক মর্যাদার অধিকার-প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে মরণ-পণ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। কে জানে এর পরিণতি কোথায়? বিদেশী যুগে ইংরেজ শাসকের দমননীতির ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে অরবিন্দ লিখেছিলেন,

> "অবিচার মৃত্যুকে ডেকে আনে এবং বিধাতার আবির্ভাবের পথ তৈরী করে দেয়। যে মুহূর্তে শাসক শ্রেণীর মন থেকে সুবিচার করবার ইচ্ছা চলে যায়, যে মুহূর্তে ন্যায়ধর্মের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও তার মনে আর অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই আরম্ভ হয় সে-শাসনের অবসান।"
>
> ("Injustice is an invitation to death and prepares His (God's) advent. The moment the desire to do justice disappears from a ruling class, the moment it ceases even to respect the show of justice, from that moment its days are numbered.")

আর-এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন,

> "অত্যাচার মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে না। অত্যাচার তার বিশ্বাসকে বরং করে তোলে আরও শক্তিশালী। স্বাধীনতার বীজ যখন একবার অনুরাগী ও অকপট মানুষের রক্তে অঙ্কুরিত হয়, তখন পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে।"
>
> "Persecutions do not crush but only fortify conviction and no power on earth can exterminate the seed of liberty when it has once germinated in the blood of earnest and sincere men.")

অত্যাচারে পীড়িত, অবমাননায় লাঞ্ছিত, মানবিক অধিকারে বঞ্চিত বাঙালীকে আবার নতুন করে কঠোর আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণ করতে

হবে। স্বদেশী যুগের গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আজ আবার তার স্মরণ করা প্রয়োজন। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বলেছিলেন—স্বাধিকার লাভের জন্য আমাদের হতে হবে মৃত্যুভয়হীন। তাঁরা আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন চরম ত্যাগ ও দুঃখবরণ করবার জন্য, নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাজের জন্য আমাদের করতে হবে মরণ-পণ সংগ্রাম। তাঁরা যে-স্বরাজের আদর্শ সেদিন জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন সেই স্বরাজে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর পূর্ণ মানবিক অধিকার পেয়েছিল অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি। সেই স্বরাজ আজও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁরা যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার মর্মকথা হলো এই যে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। শক্তিমানেরাই জগতের পূজা পায়। আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অধিকার-বঞ্চিত মানুষ কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠায় বা স্বরাজ লাভে সমর্থ হয় না। স্বরাজের জন্য মানুষকে করতে হবে চরম আত্মবলিদান। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে এই মহান সত্যকে জাতির অন্তরে অনির্বাণ শিখায় প্রজ্বলিত করে গেছেন।

হৃতগৌরব, ঐতিহ্য-ভ্রষ্ট বাঙালীকে আজ এই দুর্দিনে অভয় মন্ত্র দিতে পারে তার অতীত ঐতিহ্য। অতীতের ইতিহাস হ'তে দিশেহারা বাঙালীকে আজ গ্রহণ করতে হবে এগিয়ে চলার মন্ত্র-সাধনা—যে-মন্ত্রসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। মৃত্যুর পূর্বে উপাধ্যায় লিখেছিলেন,

> "রাজা স্বদেশী হইলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা চাই—কারণ ঐ ব্যক্তিগত অধিকার লইয়াই রাজ-অধিকার গঠিত হয়। যখন স্বদেশীরাজ্যেই এই ব্যবস্থা তখন অনাত্ম সমাজ-বহির্ভূত বিদেশীয় শক্তির শাসনকালে এই ব্যক্তিগত অধিকারের অনুশীলন যে একান্ত অপরিহার্য তাহা আর যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে হইবে না।...আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা ও ব্যস্ত বিপর্যস্ত করাই অনাত্মের স্বভাব। দেখ—অনাত্ম ফিরিঙ্গি-শক্তি কেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া প্রথমে আমাদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিল—পরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজকে বিপর্যস্ত করিবার

চেষ্টা করিতেছে।…এখন যদি আত্মরক্ষার অধিকার শীঘ্র শীঘ্র প্রতিষ্ঠা না করি তা হইলে সমাজের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িবে।"

উপাধ্যায়ের জীবন-সাধনা যদি আমাদের জীবনে কিছুমাত্র সত্য হয়ে ওঠে, তবেই তাঁর জীবনেতিহাস-অনুধ্যান হবে সার্থক।

বর্তমান গ্রন্থখানি রকমারি সরকারী-বেসরকারী দলিলের সাহায্যে রচিত হয়েছে। বহুদিন পূর্বে প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর এ পর্যন্ত উপাধ্যায় সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি।

এই পুস্তক প্রণয়নে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক টুম্‌স্ নানাভাবে আমাদের যে অকৃপণ সাহায্য করেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বস্তুত, তাঁর অফুরান উৎসাহ ও সহায়তা না পেলে বর্তমান গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত রচিত হতো কিনা সন্দেহ। 'পরিশিষ্টে' সংযোজিত উপাধ্যায়ের রচনাগুলি দুষ্প্রাপ্য 'স্বরাজ' ও *Twentieth Century* পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীঅনাদিভূষণ দাস ও চন্দননগরের শ্রীরামেশ্বর দে মহাশয়দ্বয়। পুস্তকে ব্যবহৃত উপাধ্যায়ের হস্তলিপির 'ব্লক্'খানি শ্রীযুক্ত ত্রিদিবেশ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। "বাংলার বিশ্বকবি" শীর্ষক উপাধ্যায়ের ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন সাহিত্য-সাধক শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়। 'স্বরাজ' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত, 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "স্বদেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেম" নিবন্ধটি বিপিনচন্দ্র পালের রচনা। গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রথম পঙ্‌ক্তি-তে "উপাধ্যায়ে"র নামটি ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে। ঐস্থলে "বিপিনচন্দ্রে"র নামোল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

১২।৫, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯
২৭শে মে, ১৯৬১

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

উৎসর্গ

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির
মহৎ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে
যাঁরা তিলে তিলে করে
জীবন দান করেছেন
তাদের গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশে

সন্ন্যাসী বেশে ব্রহ্মবান্ধব
(১৮৯৫)

প্রায়শ্চিত্তের পর ব্রহ্মবান্ধব
(১৯০৭)

বিলাত-প্রবাসী ব্রহ্মবান্ধব
(১৯০৩)

'সন্ধ্যা' পত্রিকা পরিচালন কালে ব্রহ্মবান্ধব

(১৯০৪-১৯০৭)

প্রথম অধ্যায়

স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি

বাংলা তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন এক নতুন গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচনা করেছে। জাতীয় ইতিহাসের এই নব অধ্যায়ের সঙ্গে যাঁদের অকৃত্রিম শ্রম ও সাধনা সুজড়িত, যাঁদের অগ্নিমন্ত্র শ্রবণ করে একদিন স্বজাতি ও স্বদেশবাসী বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলভার ভেঙে ফেলতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁদের শুধু গোত্রান্তর্গত নন, তাঁদের মধ্যে এক অতিপ্রধান অধিনায়ক। তৎকালীন বঙ্গসংস্কৃতিতে ও রাজনীতিতে তিনি যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা অনেকটা তুলনাবিহীন। তাঁর চরিত্র ও আদর্শবাদ সেকালের দেশকর্মীদের কাছে প্রেরণার অফুরন্ত উৎস ছিল। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার ঊষাকালে তিনি নিদ্রিত জাতির কানে অনাগত স্বরাজের বোধন-শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। তাঁর সহজ, সরল, মেঠো বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধে ফিরিঙ্গি সভ্যতার উপর আক্রমণ লক্ষ্য করে এদেশের জনসাধারণ চমকে উঠলো। বাংলার রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের মত এই মহাকর্মীও একদিন গণনীয় রেখাপাত করেন। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হয়ে' স্বল্পকালের জন্য দিগন্তকে আলোকিত করে' তিনি আবার জ্বলতে জ্বলতে শূন্যে বিলীন হয়ে যান। "ফিরিঙ্গির কোনো জেলখানা আমাকে আটক করতে পারবে

না”—মৃত্যুর পূর্বে তিনি একথা ঘোষণা করেছিলেন*(১)। পুরাণো যুগের সে-স্মৃতি একালে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বিগত যুগের জাতীয় ইতিহাসের অনেক কর্ম ও কাহিনী সাড়ম্বরে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু অগ্নিযুগের এই স্বদেশপ্রাণ যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাসে আজও বাঙালী উদাসীন। জনমানসে তাঁর স্মৃতিটুকু পর্যন্ত লুপ্তপ্রায়। যে নির্ভীক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে বক্তৃতাবলী প্রদান করে' সেখানে ভারতবাসীর জন্য ঠিকানা কায়েম করেছিলেন, যিনি একদা 'সোফিয়া' (*Sophia*) ও 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' (*Twentieth Century*) পত্রে উচ্চ দার্শনিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে তৎকালের বিদগ্ধসমাজকে মুগ্ধ করে দেন, যে মনস্বী একদিন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সেই কীর্তিমান উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী এখনো কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পর স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা বিপিনচন্দ্র পাল ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন,

> “আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু

* (১) ১১ই এপ্রিল ১৯০৮ সনে 'বন্দে মাতরম্' দৈনিকে প্রকাশিত “The Demand of the Mother” শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রবন্ধটি অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। ইহা বর্তমান লেখকদের *India's Fight for Freedom* (কলিকাতা, ১৯৫৮) গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

> উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন"* (২) ?

আবার এরও বহুকাল পরে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার উপাধ্যায়ের কথাপ্রসঙ্গে লিখলেন,

> "আজ সেই পুরুষসিংহকে—স্বদেশের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ, বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দমঠের সেই 'সত্যানন্দ'-সদৃশ সন্ন্যাসীকেও বাঙালী ভুলিয়াছে—কোন উপলক্ষ্যে একবারও স্মরণ করে না; অথচ কত চুনাপুঁটিকে লইয়া মাতামাতি করে। এ জাতির কল্যাণ হওয়া বড়ই কঠিন"* (৩)।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের প্রাচুর্য ও সমারোহের মধ্যে আমরা, বিশেষ করে বাঙালী জাতি, যেন উপাধ্যায়ের কথাও বিস্মৃত না হই। তা'হলে পিতৃঋণ অস্বীকারের অপরাধে আমরা ইতিহাসের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো* (৪)।

বংশ-পরিচয় ও জন্মস্থান

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রপিতামহ ঈশ্বর মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কনৌজীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে এই বন্দ্যোপাধ্যায়

* (২) বিপিনচন্দ্র পালের "চরিত-চিত্র" (কলিকাতা, ১৯৫৮) গ্রন্থে "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ২০২) দ্রষ্টব্য।

* (৩) 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ৪১৮

* (৪) উমা মুখোপাধ্যায় রচিত "Upadhyay Brahmabandhab (1861-1907)" শীর্ষক প্রবন্ধ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৯ সনের *Hindusthan Standard* পত্রিকায় পঠিতব্য।

পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সমাজের চোখে সম্মানজনক বলে বিবেচিত হতো। তাই ভবানীচরণের প্রপিতামহ যখন পুরোহিতের কার্যোপলক্ষে গ্রামে গ্রামে গমন করতেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁর সহিত তাঁদের কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতেন। এইভাবে তিনি সর্বসাকুল্যে চুয়ান্নবার বিবাহ করেন* (৫)। সর্বশেষে তিনি বিবাহ করেন কলিকাতা থেকে আটত্রিশ মাইল দূরে হুগলী জেলাস্থ হোড়া গ্রামের এক মেয়েকে। ভবানীচরণের পিতামহ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে মাতুলালয়ে লালিত পালিত হলেও পরে হোড়া গ্রাম থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে খন্নান গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। খন্নান গ্রাম কলিকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন* (৬)।

ভবানীচরণের পিতামহ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জবলপুরে ঠগী বিভাগে পুলিশ ইন্স্পেকটার ছিলেন এবং ঠগী দমনের কাজে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বহু বিবাহপ্রথার বিরোধী এবং নিজে মাত্র দুবার বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয়

* (৫) এই সকল তথ্য উপাধ্যায়-শিষ্য ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ কর্তৃক লিখিত "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" সংক্রান্ত ইংরেজি পাণ্ডুলিপি (পৃষ্ঠা ১) থেকে গৃহীত।

* (৬) ১৯০৮ সনে প্রকাশিত অণিমানন্দের লিখিত *Swami Upadhyay Brahmabandhav* পুস্তকে (পৃঃ ১) উপাধ্যায়ের জন্মদিবস হিসাবে ১৮৬১ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহা ঠিক নয়। কলিকাতাস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার টুর্মস্ (Father Turmes)-এর নিকট উপাধ্যায়ের যে কোষ্ঠী সংগৃহীত রয়েছে, তা থেকে উপাধ্যায়ের জন্মতারিখ পাওয়া যায় ১৮৬১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী। প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" পুস্তকেও ঐ শেষোক্ত তারিখটিই উল্লিখিত আছে।

পক্ষের তিন পুত্রের নাম হলো যথাক্রমে দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবীচরণের আবার তিন পুত্র—হরিচরণ, পার্বতীচরণ ও ভবানীচরণ। দেবীচরণ প্রথম জীবনে জবলপুরে বসবাস করলেও পিতার মৃত্যুর পর আবার খন্নান গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে দোতালা বাড়ী ও তৎসংলগ্ন একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মাতাঠাকুরাণী ছিলেন নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপরায়ণা হিন্দুনারী। আশৈশব মাতৃহীন ভবানীচরণ এই পিতামহীর কোলেই স্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হন। শৈশবে তিনি পিতার সঙ্গও তেমন লাভ করতে পারেন নি। তাঁর পিতাও ছিলেন পুলিশ ইন্স্‌পেকটার। তাই গৃহে থাকবার অবকাশ তিনি স্বল্পই পেতেন। স্বভাবতই ভবানীচরণের শৈশবকালের শিক্ষা দীক্ষা পিতামহীর কাছেই সাধিত হয়। পিতামহীর প্রভাব তাঁর জীবনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। "শৈশবে পিতামহীর নিকট দিনরাত থাকিয়া উপাধ্যায় খাঁটি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর অনেক কথাবার্তা এবং সেকালের অনেক হেঁয়ালী ও গ্রাম্য ছড়া শিখিয়াছিলেন।...এই সকল গৃহস্থালীর কথাবার্তা, হেঁয়ালী ও গ্রাম্য ছড়া পরে তাঁহার সন্ধ্যার মধ্যে অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছিল"*(৭)।

বাল্যশিক্ষা ও কৈশোর

প্রথম শৈশবে ভবানীচরণের বিদ্যারম্ভ হয় খন্নান গ্রামস্থ পীতাম্বর পণ্ডিতের পাঠশালায়। পাঠশালার গুরু "শাসনদণ্ডের দ্বারা পদ-

* (৭) প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" (পৃষ্ঠা ২) দ্রষ্টব্য। বহু প্রামাণিক উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বইখানি উপাধ্যায় সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত রচিত একমাত্র জীবনী। ইংরেজিতে উপাধ্যায়ের জীবনী ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ তাঁর *The Blade* (কলিকাতা, ১৯৪৭) পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মহত্ত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ” রাখতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। আশৈশব দুরন্ত ভবানীচরণও মাঝে মাঝে গুরুর বেত্রদণ্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হলে পিতৃদেবের কর্মস্থল চুঁচুড়ায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় ও সেখানকার হিন্দু স্কুলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। তৎপর পিতার হুগলীতে বদলির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে স্থানান্তরিত হলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি তাঁর মেধার পরিচয় দিতে থাকেন। এর পর তিনি তাঁর পরিবারের অন্যান্যের সঙ্গে কলিকাতায় চলে আসেন ও সেখানকার জেনার‍্যাল্ এসেমব্লীজ্ ইনষ্টিটিউশনে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মিষ্টার জার্ডিন (Mr. Jardin) তখন ঐ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই অল্প বয়সেও ভবানীচরণের ইংরেজি উচ্চারণের পরিপাটি অধ্যক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালীন তিনি একবার দশম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজি রিডিং পড়ার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হলে তাঁর পরিবারবর্গ পুনরায় হুগলীতে ফিরে আসেন ও তখন তাঁকে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রয়োদশ। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি ঐ বিদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন।

ডানপিটে ভবানী

হুগলী আসার পর ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ভবানীচরণের উপনয়ন হয়। উপবীত ধারণের পর তিনি নিষ্ঠাচারী ব্রহ্মচারীর মত সকল ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে থাকেন—এমন কি, এক বছর যেতে না যেতেই তিনি মাছ মাংস ভক্ষণও চিরতরে ত্যাগ

করেন* (৮)। মূল শাস্ত্র থেকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গমের উদ্দেশ্যে তিনি ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত শিক্ষাও সুরু করেন। ভাটপাড়ার টোলে পণ্ডিতদের কাছে তিনি যে সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চা আরম্ভ করেন, সে প্রভাব তাঁর ভবিষ্য জীবনে অতি-উজ্জ্বল-ভাবে প্রকটিত হয়েছিল। শরীর চর্চার দিকেও তাঁর খেয়াল ছিল বরাবর। ব্যায়াম, কুস্তী, যুযুৎসু, লাঠি-চালানো প্রভৃতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। বাংলার বিখ্যাত পালোয়ান অম্বিকাচরণ গুহের তিনি এককালে প্রিয় স্যাকরেৎ হয়েছিলেন। সাঁতারু হিসাবেও অল্প বয়স থেকেই তিনি কীর্তিমান হয়ে ওঠেন। ক্রিকেট খেলায়ও তাঁর নৈপুণ্য ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় *(৯)। সাধারণতঃ পড়ুয়া ভাল ছাত্র বলতে যে নিরীহ, শীর্ণকায়, ভগ্নস্বাস্থ্য চেহারা মনে পড়ে, ভবানীচরণের চালচলন, খেয়াল ও মতিগতি তা থেকে ছিল বেশকিছু পৃথক। বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ

* (৮) ইহার পর ভবানীচরণ সৈনিক ব্রত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র যাবার পথে ধোলপুরে একবার মাত্র মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, "ধোলপুরে গিয়া উমাচরণ বাবুর বাটীতে নামিলাম।…রাত্রিতে মটন রাঁধা হইল…তখন আমি মাছমাংস প্রায় পাঁচ বছর ছাড়িয়া দিয়াছি—মটন কি করিয়া খাই। কিন্তু—খাইব না,—বলিতে বড়ই লজ্জা করিল। যুদ্ধ শিখিতে যাইতেছি অথচ মাংস খাই না—দুয়ে যেন মিলে না। তাই লজ্জায় পড়িয়া পুরা বাটি পার করিলাম—আবার চাহিয়া লইলাম। খাইতে খাইতে পূর্বস্বাদ জাগিয়া উঠিল—মন্দ লাগিল না। এই মাংস খাওয়ার পরে আর কখনও মাছ মাংস খাই নাই। আর এখন বুড়া হইতে চলিলাম—বয়স সাতচল্লিশ হইয়াছে—মাংস খাবার লোভ আর নাই।" উপাধ্যায়ের লেখা "আমার ভারত উদ্ধার" প্রবন্ধ ১২ই ও ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সালের 'স্বরাজ' পত্রে দ্রষ্টব্য।

* (৯) "He could bowl and bat splendidly. Some of his half pitches were very vicious and none but a trained batsman could meet them with success." অণিমানন্দ রচিত *Swami Upadhyay Brahmabandhav*, Part I. (p.7) দ্রষ্টব্য।

সীমানার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের অল্প অংশই প্রকটিত হয়েছিল। অবকাশ সময়ে তিনি বাড়ীতে প্রায়ই সংস্কৃত চর্চায় ও ইউক্লিডের সমস্যা সমাধানে নিমগ্ন থাকতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে চিরাচরিত ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেছিলেন, সেই বন্ধনহীন উদ্দাম মনের পরিচয় তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই পাওয়া যায়।

তৎকালে চুঁচুড়ায় ও হুগলীতে বহু আর্মেনিয়ান লোকের বসতি ছিল। পাড়ার বাঙালী মেয়েরা নদীতে স্নান করতে গেলে আর্মেনিয়ান যুবকেরা প্রায়ই তাদের বিরক্ত করতো, অনেক সময় তারা কলসী নিয়ে জল আনতে গেলে তাদের কলসীও ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিত। ঐ সব দুষ্টু ছেলেদের বহুবার সাবধান করা সত্ত্বেও কোন ফললাভ হলো না দেখে ভবানীচরণ পরিশেষে তাদের জন্য লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করেন। সমবয়সীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বলশালী ও আর্মেনিয়ান যুবকদের অশিষ্টতা দমনে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহী। আর্মেনিয়ান যুবকদের তিনি ও তাঁর বন্ধুরা মিলে একদিন এমন বেদম প্রহার করেছিলেন যে, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত অবধি গড়ালো। কিন্তু অবশেষে আপোষে ঐ গণ্ডগোল সেবারকার মত মিটমাট হয়ে যায়। আবেদন-নিবেদনের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে নিজ মান ও ধর্ম রক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই যে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব এই ধারণা আর্মেনিয়ান যুবকদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ভবানীচরণের মনে দৃঢ়তর হয়। শক্তি-চর্চা ছাড়া দেশের মুক্তি নেই এই খেয়াল ক্রমশ তাঁর মাথায় ঘর করে বসে। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন একবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতে এলে, তরুণ ভবানীচরণ আর্মেনিয়ান

যুবকদের বেয়াদপির কথা তাঁর কছে বিবৃত করে' এই বিষয়ে তাঁর পরামর্শ কামনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তিনি বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করবেন, কিন্তু ভবানীচরণ তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, "আবেদন নিবেদনে কার্যোদ্ধার হবে না। আসল ঔষধ তাদের দেওয়া দরকার।" যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ও সৈনিক ব্রত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তরুণ বয়সেই তাঁর মনকে চঞ্চল করে তোলে। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে (১৮৭৬-৭৭) তাঁর মনের গতি ক্রমশঃ ঐদিকে ঝুঁকতে থাকে।

ভারত-উদ্ধারে গোয়ালিয়র যাত্রা

এই সময় আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতায় "স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশান" বা "ছাত্র সভার" প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৭৫)। বাংলার যুবসম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করবার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল* (১০)। সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিময়ী বক্তৃতা যুবক দলকে সহজেই আকৃষ্ট করলো। দেশে নতুন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ-উচ্চারিত জাতীয়তার বাণী সেকালে কলিকাতার ছাত্রসমাজে কি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আজও বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীতে ধরা রয়েছে * (১১)। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়

* (১০) বর্তমান লেখকদের *The Growth of Nationalism in India* গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৬০-৬২) দ্রষ্টব্য।

* (১১) B. C. Pal's *Memories Of My Life And Times*, Vol. I. (কলিকাতা, ১৯৩২, পৃষ্ঠা ২৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য।

উপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে যে বিপুলভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তৎপ্রচারিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌক্তিকতায় বরাবরই তাঁর আস্থা ছিল বড় কম। তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের মানসিক বিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন :

> "যখন আমার বয়স চৌদ্দ পনরো বৎসর তখন স্থরেন বাঁড়ুজ্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালী বাঁড়ুজ্যে আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। লেকচারে লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া দাওয়া নাই—শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—নেকচারেই দেশটাকে খেলে।
>
> "লেকচার না শুনিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত—কিন্তু যখন লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া বাড়ী ফিরিতাম—তখন মনে হইত—প্রাণটা যেন খালি খালি—ভরে নাই। এ রকমে বৎসর দুই কাটিয়া গেল—এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কালেজে উঠিলাম। তখন বয়স সতেরো বৎসর। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। স্থরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা কিছুতেই পোষাইবে না—মনে হইতে লাগিল। ছেলে মানুষ—স্থরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মনে মিলে না—বলিলেই ত লোকে জ্যাঠা বলিয়া উড়াইয়া দিত। এক দিন প্রাণের আবেগে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন মর্ট্‌স লেনে রাজা শ্রীযুত স্থবোধ চন্দ্র মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিতেন। তিনি আমায় চিনিতেন না। কিন্তু আমার পিতৃব্যদেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু বলিয়া আমার সহিত তিনি খুব হৃদয় খুলিয়া কথা কহিলেন। পরিচয়ের পরই আমি তাঁহাকে দুম্ করিয়া বলিলাম—Not through pen but through sword—অর্থাৎ কলমবাজিতে হইবে না—তলোয়ারবাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে। ···তিনি ধীরে ধীরে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে মানবজাতি আর তত বর্বর নাই —এখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে—বিশেষতঃ

ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার দূতস্বরূপ (apostle)—তাই এ কালে বৈধ আন্দোলনই (constitutional agitation) যথেষ্ট—পাশব শক্তি-প্রয়োগের আর অবকাশ নাই।—আমি ত এই কথা শুনিয়াই অস্থির হইয়া উঠিলাম। যত শীঘ্র পারিলাম বিদায় লইয়া বাটী আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করি কোথায় যাই। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিলাম—গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব—যুদ্ধবিদ্যা শিখিব—ফিরিঙ্গি তাড়াইব"* (১২)।

"তলোয়ারবাজিতে" ভারত উদ্ধারের আবেগ এই সময় ভবানীচরণের মনকে ভীষণভাবে ব্যাকুল করে তোলে। ১৮৭৭ সনে—তাঁর যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন—তিনি জুলু যুদ্ধে সৈনিকের ব্রত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একখানি আবেদনপত্রও কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন তাঁর বৈমাত্রেয় পিতৃব্য নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনারে অফিসে চাকুরী করতেন। ভবানীচরণ তখনও নাবালক এই কারণে তিনি তাঁর ঐ আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন নি * (১৩)। কিন্তু ভবানীচরণ নিরুৎসাহিত হবার পাত্র নন। তিনি অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্বদাই জীবনে চালিত হতেন। প্রাণের উচ্ছল আবেগে তিনি হুগলী কলেজে পড়াকালীন ঘর ছেড়ে পথে বের হলেন সৈনিক হবার উদ্দেশ্যে। তাঁর ইচ্ছা ছিল পশ্চিম ভারতে গমন করে' কোনও দেশীয় রাজার অধীনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা। সতেরো বৎসর বয়সে কলেজের পড়াশুনা

* (১২) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রণীত "আমার ভারত উদ্ধার" প্রবন্ধ তৎ-সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় ১২ই ও ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সালের অর্থাৎ ২৬শে মে ও ২রা জুন, ১৯০৭ সনের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

* (১৩) বি. অনিমানন্দ লিখিত *The Blade* পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য।

বদ্ধ করে' চার বাঙালী বন্ধু মিলে ভবানীচরণ এবার সত্য সত্যই ভারত উদ্ধারের সাধনায় নিঃসম্বল অবস্থায় গোয়ালিয়র উদ্দেশে রওনা হলেন * (১৪)। যথাসময়ে গোয়ালিয়র পর্যন্ত পৌঁছুলেন। কিন্তু গৃহ-পলাতক বালকদের আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানে তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন, তাঁদের সকলকেই আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো। ভবানীচরণকে এবার তাঁর বাড়ীর লোকেরা কলিকাতাস্থ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে (বর্তমানের বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি করিয়ে দিলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। তাঁর ইংরেজি পড়া শুনবার জন্য তখন ছাত্রমাত্রেই উদ্‌গ্রীব, "কেলাসে ছেলে আর ধরে না"। কিন্তু গোয়ালিয়র থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে' ফিরে আসার পর ভবানীচরণের অন্য কোনকিছুই আর ভাল লাগে না। নিজের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বহুদিন পরে লিখলেন,

> "মন এমনি খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে খুব সিদ্ধি খাইতে সুরু করিলাম। এত সিদ্ধি খাইতাম যে কালেজেও নেশার ঝোঁক যাইত না। আমার বেশ মনে আছে—এক দিন সুরেন বাবু পড়াইতেছিলেন আর আমি বহির গাদা আড়াল দিয়া নিদ্রা দিতেছিলাম—এমন সময় আমাদের পাঠ্য পুস্তকের কোন বিশেষ সংস্করণ দেখিবার জন্য সুরেন বাবুর প্রয়োজন হয়। ঐ সংস্করণ আমার কাছে ছিল। কে এক জন বলিয়া দিল যে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তখন সুরেন বাবু বলেন—আমি মানুষটিকে চাহি না—

* (১৪) প্রবোধচন্দ্র সিংহ "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" পুস্তকে লিখেছেন যে, গোয়ালিয়র যাত্রার পূর্বেও ভবানীচরণ একবার ঐ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে ঘর ছেড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হবার পূর্বেই তাঁর মধ্যম ভ্রাতা পার্বতীচরণ তাঁকে পাণ্ডুয়া থেকে ধরে বাড়ী ফিরিয়ে আনেন।

মানুষটির বহিখানি চাই।—ইহাতেই বুঝা যাইবে আমার মনের গতিক কি রকম ছিল। তার পরে সিদ্ধি ছাড়িয়া দিলাম। সেই যে ছাড়িলাম আর কখনও খাই নাই। মনটাকে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—আবার গোয়ালিয়র যাইব—যোদ্ধা হইব—সুরেন বাঁড়ুজ্যের বৈধ আন্দোলন ছাড়িয়া তরবারির চমকে দিগদিগন্ত ঝলসাইয়া তুলিব—ফিরিঙ্গিকে চমকাইয়া দিব।… যাহা হউক আবার এক বৎসরের মধ্যে কালেজের পড়াশুনা ছাড়িয়া পুনরায় গোয়ালিয়র যাই”*(১৫)।

দ্বিতীয়বার গোয়ালিয়র যাত্রার সময় ভবানীচরণ নিজ উদ্দেশ্য সফল করবার আকাঙ্ক্ষায় অন্য কাউকে আর সঙ্গে নিলেন না। তিনি একাকীই বহির্গত হলেন। গোয়ালিয়র পৌঁছুলেন—সিন্ধিয়া মহারাজের সেনাপতির সহিতও তাঁর সাক্ষাৎকার হলো। “আমি বলিলাম—আমাকে সৈনিক করিয়া লউন। তিনি বলিলেন যে তিনি নামে সেনাপতি বটেন কিন্তু তাঁহার একটুও ক্ষমতা নাই। সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার অগাধ ভক্তি জন্মিল। কি সৌম্য মূর্তি! সৌম্যতা শিষ্টতার ভিতরে এক অপূর্ব অগ্নিময় তেজ সঞ্চারিত হইতেছিল। চোখ দুটি যেন বহ্নিজ্বালা। সেনাপতির সরল বিনীত কথা শুনিয়া অবাক হইলাম—মর্মাহত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম”* (১৬)।

গোয়ালিয়র যাত্রার উদ্দেশ্য এবারও সফল হলো না। গোয়ালিয়র অভিজ্ঞতায় দেশীয় রাজাদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের উচ্চাশা ধূলিসাৎ হয় এবং তিনি দেশীয় রাজার অধীন সৈন্যবিভাগে যোগদানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কলেজের

* (১৫) ‘স্বরাজ’ পত্রে (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪) “আমার ভারত উদ্ধার” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (১৬) উক্ত পত্রিকা দ্রষ্টব্য (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪)।

বাঁধাধরা পড়াশুনায় আর মন গেলো না। দেশমুক্তির সঙ্কল্পে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে' তিনি কিছুদিন উদাসীর মত উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। স্বদেশের জন্য যে-ব্যাকুলতা এতদিন তাঁর তরুণ মনকে চঞ্চল করে রেখেছিল, গোয়ালিয়র অভিজ্ঞতার পর সে-ব্যাকুলতা তাঁকে ভগবৎদর্শনের দিকে টেনে নিয়ে চলে। এইভাবে নানা স্থান পর্যটন করে অবশেষে ভবানীচরণ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সে ১৮৮০-৮১ সনের কথা।

ব্রাহ্মমতের অনুসরণ

এই সময় ভবানীচরণের মন ক্রমশই ধর্মচর্চার দিকে বেশি বেশি আকৃষ্ট হতে থাকে। তখন একদিকে চলেছে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলন, আর অন্যদিকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আয়োজন। ১৮৬০-৭০ সনে কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও জনপ্রিয় নেতা। তাঁর বক্তৃতার সম্মোহনে সেকালের তরুণদল বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার নবজাগরণে তাঁর দান অসাধারণ। ১৮৭০ সনে ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে গমন করেন। বিলাতে তাঁর বক্তৃতাবলী যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে সেই স্মরণীয় ঘটনাও আমাদের মনে গভীর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনে এবং আমাদের জাতীয় গৌরবকে উদ্দীপ্ত করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু অষ্টম দশকের শেষ দিক থেকে বাংলা দেশে কেশবচন্দ্রের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৭৫-৭৬ সনের সময় থেকে রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে দেশের যুবকেরা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারবাদী নেতা কেশবচন্দ্র অপেক্ষা জাতীয়তার মন্ত্র-প্রচারক সুরেন্দ্রনাথের দিকে

বেশি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে * (১৭)। ১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শনের' প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৫-৭৬ সনে আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক "ছাত্রসভা" ও "ভারত সভার" স্থাপন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে নবরসে সিঞ্চিত করলো। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কেন্দ্র করে এই সময় বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের লগ্নও উপস্থিত হয়। এর পরবর্তী ঘটনা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম তরুণ দলের বিদ্রোহ ঘোষণা ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। এর পর নবম দশকের গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্র প্রবর্তন করেন তাঁর ভক্তিমূলক "নববিধান"। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত নববিধানে পুরাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা ছিল। এর মধ্যে হরিনাম-সঙ্কীর্তনের প্রাধান্য লক্ষণীয় হলেও তার সঙ্গে খৃষ্টতত্ত্বও ছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মেশানো। ভবানীচরণ কেশব-চন্দ্রের সুললিত ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হয়ে' অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হলেন (১৮৮১)। কেশবচন্দ্রকে তিনি বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেন। তৎকালে কেশবচন্দ্র কলিকাতায় যে "বাইবেল ক্লাস" খোলেন, ভবানীচরণ তাতেও গভীর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম যৌবনের ধর্মবিশ্বাস প্রধানত কেশবচন্দ্রের বাণী ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করলেও দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাঁর মন তেমনভাবে আকৃষ্ট হলো না। রামকৃষ্ণদেবকে তিনি পরম শ্রদ্ধা করলেও তিনি মূলত থাকলেন কেশবপন্থী।

* (১৭) বর্তমান লেখকদের "জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" (কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১১৮—১২৬) এবং *The Growth of Nationalism in India* কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১১৭—১২০) পুস্তকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

কেশবচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যায় তাঁর মন ক্রমশ খৃষ্টানধর্মের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সেই সঙ্গে খুল্লতাত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবও তাঁর জীবনে লক্ষণীয়। কেশবচন্দ্রের দেহাবসানের পর (১৮৮৪) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের নববিধান শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। ভবানীচরণের ধর্মবিশ্বাস প্রতাপচন্দ্রের দ্বারাও বিপুলভাবে প্রভাবিত। ১৮৮৭ সনের ৬ই জানুয়ারী তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন * (১৮)।

শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা

কলেজের পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার পর ভবানীচরণের জ্ঞানস্পৃহা পূর্বের থেকে আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি বাড়ীতে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর অনুশীলনে ব্রতী হলেন। তিনি হিন্দী ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষালাভের চেষ্টা করেন। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপনের পূর্বেকার খেয়াল এখন তাঁর মনে দৃঢ়তর হয়। ধর্মানুশীলনে ও স্বদেশের সেবায় তাঁর মনপ্রাণ ক্রমশই বিভোর হতে থাকে। জীবন ধারণের অবলম্বন হিসাবে তিনি শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার পথ গ্রহণ করলেন। গোয়ালিয়র অভিজ্ঞতার পর প্রথমে তিনি কিছুদিন বর্ধমান জেলার মেমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তৎপর তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যটন করে' কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর "ফ্রি চার্চ ইনিষ্টিটিউশনে" শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন (১৮৮১)। ছাত্রদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ থাকলেও তিনি প্রয়োজনমত কঠোর ভাবও অবলম্বন করতে পারতেন।

* (১৮) *The Blade*, p. 31

এই বিদ্যালয়ে তিনি প্রায় বছরখানেক সংশ্লিষ্ট থাকেন * (১৯)। বিংশ শতকের সূচনায় ভবানীচরণের একনিষ্ঠ সহকর্মী কার্তিক-চন্দ্র নান এই বিদ্যালয়েই তাঁর ছাত্র ছিলেন। ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি কোনো কোনো পরিবারে গৃহশিক্ষকতার কার্য আরম্ভ করেন।

'ঈগেল নেষ্ট' ও 'কংকর্ড ক্লাব'

১৮৮৩ সনে কলিকাতায় কয়েকটি স্নাতক-পূর্ব ছাত্র মিলিত হয়ে তাঁদের পড়াশুনা ও আলাপ-আলোচনার জন্য 'ঈগেলস্ নেষ্ট' (The Eagle's Nest) নামে একটি ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপন করেন। প্রথমে এই সমিতির আস্তানা ছিল কলেজ ষ্ট্রীটের নিকট ভবানীচরণ দত্ত লেনে, পরে বিবেকানন্দ রোড ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে ২৯।২ মদন মিত্র লেনে। ভবানীচরণ এই সমিতিতে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই সমিতির পক্ষ থেকে প্রথমে হস্তলিখিত ও পরে মুদ্রিত পত্রিকাও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমিতির সদস্যদের কেউ কেউ বি, এ, পাশ করলে উক্ত সমিতির কার্যালয় ১৭নং ভবানীচরণ দত্ত লেনে স্থানান্তরিত হয় এবং নিজস্ব প্রেসে 'ইয়ং ম্যান' (Young Man) নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এই পত্রিকা সম্পাদনার ভার নন্দলাল সেন ও ভবানীচরণ গ্রহণ করেছিলেন (১৮৮৫)। ১৮৮৬ সনে এই পাক্ষিক পত্রিকা 'কংকর্ড' (The Concord) সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হলো। পরে ঐ বৎসরই

* (১৯) B. Animananda's *Swami Upadhyay Brahmabandhav*, Part I, p. 7

১৮নং বেথুন রো-তে [তৎকালীন ১৮নং কৃষ্ণ সিংহী লেনে (?)] কার্তিকচন্দ্র নানের বাড়ীতে 'কংকর্ড ক্লাব' স্থাপিত হলে সাপ্তাহিক 'কংকর্ড' পত্র উক্ত ক্লাবের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। 'কংকর্ড ক্লাব' ছিল 'ঈগেল নেষ্টে'র পরবর্তী ধাপ। এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য ছিল যুবকদের শারীরিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নের সহায়তা করা। এর তত্ত্বাবধানে দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, বক্তৃতা ও বিতর্ক, সংগীতসাধনা ও খেলাধূলার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল। এই ক্লাবের সভ্যদের প্রত্যেককে প্রতিমাসে এক টাকা করে চাঁদা দিতে হতো এবং ভর্তির সময় নতুন সভ্যকে দিতে হতো তদুপরি আরও দু'টাকা। কুচবিহারের মহারাজা এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার (W. W. Hunter) ছিলেন এর সভাপতি। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি এই ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন। এমন কি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকগণেরও কেহ কেহ এই ক্লাবে যোগদান করেন। ক্লাবের স্থান সঙ্কুলান হলে ২৯৮নং আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে যেখানে ট্রাম কোম্পানীর ডিপো সেখানে) স্থানান্তরিত হয় * (২০)।

ভবানীচরণ 'কংকর্ড ক্লাবে'র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ক্লাবের সকল কর্মবিভাগেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন, তবে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতেন খেলাধূলা বিভাগের। এই ক্লাবের উদ্যোগে যে বাইবেল পাঠচক্রের ও সেক্সপীয়ার পাঠচক্রের ব্যবস্থা হয় তার পরিচালনা যথাক্রমে করতেন অক্স্‌ফোর্ড মিশনের ফাদার টাউনসেণ্ড (Father Townsend) ও প্রেসিডেন্সী কলেজের

* (২০) *The Blade* pp. 28-29

এফ. জে. রো সাহেব (F. J. Roe)। তা'ছাড়া, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা তো ছিলই। 'কংকর্ড ক্লাবে'র কর্মক্ষেত্র দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮৭ সনে সাপ্তাহিক 'কংকর্ডে'র বদলে 'মাসিক কংকর্ড' (Monthly Concord) প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ভবানী-চরণের পিতৃব্য রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় * (২১)। এর ম্যানেজার হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মাসিক পত্রে তাঁর একটি রচনাও বের হয়নি। কিন্তু সাপ্তাহিক 'কংকর্ডে' তিনি রাজনীতি বিষয়ের উপর মাঝে মাঝে 'নোট' লিখতেন।

'কংকর্ড ক্লাবে'র অতি-স্ফীতি শীঘ্রই এর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৭ সনের শেষভাগে ঐ ক্লাব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থের অনটনও এর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

* (২১) ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ লিখিত "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" সংক্রান্ত ইংরেজি পাণ্ডুলিপি (পৃষ্ঠা ৩০) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিন্ধুদেশে শিক্ষকতা

১৮৮৩ সনে কলিকাতায় 'ঈগেল নেষ্ট' স্থাপনে যে কতিপয় বিদ্যার্থী অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের একজন হলেন সিন্ধুদেশীয় হীরানন্দ। কলিকাতা থেকে বি, এ পাশ করে তিনি আবার সিন্ধু-দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও পরে সাধু হীরানন্দ নামে পরিচিত হন। কলিকাতায় থাকাকালীনই তাঁর সঙ্গে ভবানীচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এমন কি সিন্ধুদেশে প্রত্যাগমনের পরও তিনি মাঝে মাঝে ভবানীচরণের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন। তিনি ১৮৮৮ সনের জুলাই মাসে হায়দ্রাবাদে এক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ভবানীচরণের সাহায্য কামনা করে পত্র লেখেন। অল্পদিন পরেই সাধু হীরানন্দের চেষ্টায় "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী" নামে এক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই ভবানীচরণ তাঁর বন্ধু নন্দলাল সেনকে সঙ্গে নিয়ে হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় আদি বিদ্যালয়টি পুনর্গঠিত হলো। হীরানন্দ হলেন প্রধান শিক্ষক। ভবানীচরণ সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করেন ও নন্দলাল সেন গ্রহণ করেন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা। ভবানীচরণ সংস্কৃত শিক্ষক হলেও ছাত্রদের খেলাধূলার ব্যাপারেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও সুমিষ্ট, সরল ব্যবহার তাঁকে ছাত্রদের কাছে বিশেষ প্রিয়পাত্র করে তোলে। তিন বন্ধুর মিলিত চেষ্টায় ঐ বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। হায়দ্রাবাদের বিদ্যালয় পরিদর্শক মিঃ জ্যাকব (Mr. Jacob) অল্পদিন পরেই মন্তব্য করেছিলেন যে, সমগ্র সিন্ধু-

দেশের মধ্যে "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী" শ্রেষ্ঠ* (২২)। হীরানন্দের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে ঐ বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় "হীরানন্দ অ্যাকাডেমী"।

১৮৮৮ সনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে ভবানীচরণের মুলতান গমন। তাঁর পিতা তখন রোগশয্যায় শায়িত। ভবানী পিতৃবৎসল পুত্রের ন্যায় দিবারাত্র পিতার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ঐখানে থাকার সময় একদিন রাত্রে ব্রুনোর "ক্যাথলিক ফেথ্" (Bruno's *Catholic Faith*) গ্রন্থ-খানা তাঁর নজরে পড়ে। বইখানা তাঁর পিতার বইয়ের সেল্‌ফেই রক্ষিত ছিল। ঐ বই পড়ে তিনি চিন্তারাজ্যে এক নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থ পিতাকে আর বাঁচানো গেলো না। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাবিহিত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে তিনি আবার কর্মস্থলে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ভবানীচরণ ক্লাসের বাইরেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করতেন। তাদের সঙ্গে ঘুড়ি উড়ানো, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, সাঁতার কাটা সর্ববিষয়েই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। তৎকালে হায়দ্রাবাদের 'ফুলেলি খালে' সাঁতার কাটা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ভবানীচরণের চেষ্টাতেই সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ছাত্রদের কাছে স্বভাবতই তিনি যে বিশেষ প্রিয় ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হায়দ্রাবাদে ভবানীচরণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ঐ স্থানের ব্রাহ্ম-সমাজেও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আগ্রহও

* (২২) *The Blade*, p. 32

এই সময় তাঁর মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা দেয়। তিনি নিজে ব্রাহ্মপন্থী হলেও তাঁর ধর্মমত ছিল উদারতাপূর্ণ। তিনি শিখদের ধর্মমন্দিরে মাঝে মাঝে গমন করতেন। নানকের ধর্মমত জানবার জন্যও তাঁর আগ্রহ ছিল অশেষ। সিন্ধী কবি আব্দুল লতিফের কবিতাবলীর তিনি অনুরাগী হয়ে পড়েন। নিরামিষভোজী ছিলেন বলে তিনি সিন্ধী ব্রাহ্মণগণের নিকটও প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। সিন্ধুদেশে বসবাস করতে করতে তিনি সিন্ধী ভাষা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার অনেককিছুই আয়ত্ত করলেন। সিন্ধুদেশই ছিল তাঁর যৌবনের কর্মভূমি ও সাধনভূমি। সেখানে তিনি ১৮৮৮ সন থেকে ১৮৯৮ সন পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

খৃষ্টধর্মের আকর্ষণে

ভবানীচরণের ধর্মনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান ও লোকপরায়ণতা ক্রমে ক্রমে সিন্ধুদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"তে তাঁর হাতেগড়া ছাত্রদের মধ্যে পরমানন্দ্ ও ক্ষেমচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা উভয়েই তাঁকে গুরু বলে অভিহিত করতেন। কেশবচন্দ্র অনুমোদিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি এই সময় বিশেষ যত্নবান হন। যীশুখৃষ্টের মহান জীবনাদর্শ এই সময় তাঁর মনকে উদ্বেলিত করে তোলে। তাঁর খৃষ্টপ্রীতির সূচনা একদিন যৌবনের প্রারম্ভে কেশবচন্দ্রের সুললিত ধর্মব্যাখ্যার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখন সেই খৃষ্টপ্রীতি ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণ হতে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি হিন্দুধর্মের কিছু অনুশীলন করলেন বটে, কিন্তু গভীরভাবে নয়। এই ধর্মের "উপরিভাগের কিছু শিক্ষা করিলেন বটে কিন্তু ঐ এক কারণে হিন্দুধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ

হইলেন না। যতটুকু পারিলেন, সেইটুকু সর্বস্ব বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। পরন্তু ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার শান্তিলাভ হইল না। সত্যের অনুসন্ধানে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল; এবং এই ব্যাকুলতায় কিছুদিন পরে খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিলেন"* (২৩)।

কলিকাতায় থাকাকালীন (১৮৮০-৮৮) ভবানীচরণ কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে যীশুখৃষ্টকে সকল ধর্মগুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করে নিয়েছিলেন। যীশুখৃষ্টই একমাত্র সম্পূর্ণ পাপমুক্ত মহাপুরুষ বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তখনও তিনি "অবতার" বলে স্বীকার করতে পারেন নি। ১৮৮৯ সনে বড়দিনের সময় তিনি হায়দ্রাবাদে যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণে ব্যক্ত করেন যে, হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ হলো এই মর্ত্যলোকে পাপমুক্ত সদ্‌গুরু বা নিষ্কলঙ্ক অবতারের আগমনকে সম্ভব করে তোলা। যীশুখৃষ্টের জীবনেই সেই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, জগতের সকল সাধু ও মহাপুরুষেরা নিজেদের 'পাপী' বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু যীশুখৃষ্টই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত বলে ধারণা করতে পেরেছিলেন* (২৪)। এই চিন্তাপ্রণালী যুক্তিনিষ্ঠার বিচারে কতটা গ্রহণযোগ্য সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তবে ভবানীচরণের মনের গতি এই সময় কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

"হীরানন্দ অ্যাকাডেমী" হ'তে পদত্যাগ

এই সময় হায়দ্রাবাদে মিঃ জোসেফ্ রেডম্যান (Mr. Joseph Redman) নামক জনৈক পাদ্রী একটি "বাইবেল ক্লাস" খোলেন।

* (২৩) প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব", পৃষ্ঠা ৩০
* (২৪) *The Blade*, p. 35

প্রতি রবিবার সেই ক্লাসের অধিবেশন হতো। ভবানীচরণ, ক্ষেমচাঁদ, পরমানন্দ ও আরও অনেক সিন্ধী যুবক ঐ ক্লাসে যোগ দিলেন। খৃষ্টানুরাগী ভবানীচরণের মন খৃষ্টান ধর্মাদর্শের প্রতি আরও গভীরভাবে অনুরক্ত হলো। তিনি নিজেও স্থানে স্থানে খৃষ্টতত্ত্বের উপরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ নিয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ১৮৯০ সনের মে মাসে ঐ বিদ্যালয়ের কার্যে ইস্তফা দেন। ভবানীচরণ ঐ বিদ্যালয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা' বুঝা যায় যখন দেখি ঐ ঘটনাপ্রসঙ্গে সাধু হীরানন্দের জীবনচরিতকার দিওয়ান দয়ারাম গিদুমল্ লিখছেন যে, ১৮৯০ সনের মে মাসে "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী" এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গমন করে, আর এই সঙ্কটের কারণ বিদ্যালয় থেকে ভবানীচরণের পদত্যাগ* (২৫)।

ভবানীচরণের খৃষ্টপ্রীতির আতিশয্য দেখে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুরা ও সিন্ধী গুণগ্রাহীরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"র প্রধান শিক্ষক হীরানন্দ ভবানীচরণের পদত্যাগ পত্র দাখিলের স্বল্পকাল পরেই ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারযোগে কলিকাতায় সংবাদ দেন যে, তাঁর ভাই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন। ঐ তারাঘাতে হরিচরণ-বাবু শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং সেই শোক-বিহ্বল হৃদয়ে তিনি হীরানন্দকে উদ্দেশ করে ২৭শে মে, ১৮৯০ সনে এক নাতিদীর্ঘ পত্রে লেখেন ঃ

> "আপনার টেলিগ্রাম আমার কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত পৌছেছে। আমি দুইদিন ধরে আমার করণীয় সম্বন্ধে কিছু স্থির করতে

* (২৫) *The Blade*, p. 36

পারিনি; তাই উত্তর দিতে দেরী হলো। ভবানী এখন কোথায়? দয়া করে তাঁকে বলুন যেন সে তার অসুখী ভাইকে আরও অসুখী করে না তোলে। মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক তাকে তার হতভাগিনী বৃদ্ধা পিতামহীর কথা স্মরণ করতে বলুন। সেই বৃদ্ধা পুত্রশোকে চোখের জল ফেলেই চলেছেন।

"আমি বর্তমানে কলিকাতা ছাড়তে পারছি না। অল্পদিন পরেই আমার মেয়ের বিবাহকার্য সম্পন্ন হবে।…আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, যা করা প্রয়োজন আপনি তা' আমার হয়ে করুন। তাকে বলুন অন্তত আরও কিছুদিন যেন সে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত না হয়। আমাকে দেখা করে কথা বলার সুযোগ যেন সে দেয়। এর বেশি আর আপনাকে কি লিখবো? যদিও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি না, তথাপি আপনি আমার হয়ে ভাইয়ের বিষয়ে যে সহৃদয় দৃষ্টি রেখেছেন সেজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে এ চিঠি লেখা শেষ করতে পারছি না"* (২৬)।

'হার্মোনি' পত্রের সম্পাদনা

হীরানন্দ বন্ধুজনোচিত মনোভাব নিয়ে ভবানীচরণকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলেন না। শেষ পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁর খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্প আরও ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখলেন। এই সময় তিনি গভীর যত্নের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন। খৃষ্টতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯০ সনের আগষ্ট মাসে 'দি হার্মনী' *(The Harmony)* নামে একখানি মাসিক পত্রিকা স্থাপন করেন। ঐ পত্রিকা ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ

* (২৬) *The Blade*, p. 37

হিন্দুধর্ম ও বিশুদ্ধ খৃষ্টানধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন—যে সমন্বয় সাধনের আদর্শ কেশবচন্দ্র সেন একদিন প্রচার করেছিলেন। ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লিখলেন যে, ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টায় তিনি কেশবচন্দ্র প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে কৃতসঙ্কল্প। কেশবচন্দ্রের "নব বিধানের" সঙ্গে 'পতিত' মনুষ্যজাতির পরিত্রাণকর্তারূপে যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপনের কোনো সত্যকার বিরোধ নেই, যেমন বিরোধ নেই খৃষ্টপ্রীতির সঙ্গে ভারতীয় ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগের* (২৭)। উক্ত পত্রে তিনি "নব বিধান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করলেন যে, কেশবচন্দ্র যে আদর্শ ধর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তার কেন্দ্রস্থলে যীশুখৃষ্টই দণ্ডায়মান।

* (২৭) "Some call us Christian and some Brahmo. What are we then? Christian? What a sweet name! What a noble thing it is to be a Christian and believe in a loving Father that desireth not the death of a sinner. What a consolation it is to be a Christian and believe in Jesus, the Redeemer of fallen humanity and the Source of of all righteousness! ...Have we then abjured Brahmoism? Never. We believe that God raised up Keshava Chandra Sen to preach...harmony of all religions in spirit and truth. We believe also that it is our humble mission to preach and establish the principle of unity of religions as laid down by Keshava.

"But people here understand by the term 'Christian' a man who drinks liquor or eats beef, who hates the scriptures of India as lies and her inspired men as imposters. If we are called Christians in this sense of the term, we are not Christian.

"Also many think that the New Dispensation of Keshava is incompatible with the belief in Christ as the Redeemer of fallen humanity and the Source of all righteousness. If this be the New Dispensation, we are not of the New Dispensation." আগষ্ট ১৮৯০ সনের 'দি হার্মোনী' পত্রে "Ourselves" শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য।

অকালে তাঁর দেহাবসান হওয়ায় তিনি এই ভাবের সম্যক সম্প্রসারণ করে যেতে পারেন নি, আর তাঁর উত্তরসাধকেরাও উপলব্ধি করতে অক্ষম হলেন যে যীশুখৃষ্টের জীবনভিত্তির উপরেই "নব বিধান" প্রতিষ্ঠিত হবে। ভবনীচরণের এই সকল ব্যাখ্যা তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের মনঃপূত হলো না। তাঁরা বললেন, যীশুখৃষ্ট স্বর্গীয় পুরুষ বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ নন, তিনি একজন মহান মানব, আর তাঁর ভক্তেরাই তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। ভবানীচরণ একথা স্বীকার করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য যীশুখৃষ্টের শুধু স্বগায় মাহাত্ম্যের মধ্যে নয়। ঈশ্বরকে পিতৃরূপে এবং বিশ্বের স্রষ্টারূপে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা পৃথিবীর সর্বত্রই উপাসনা করে চলেছেন, কিন্তু যীশুখৃষ্টকে তাঁর ভক্তেরা উপাসনা করে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র (the Son of God) হিসাবে* (২৮)।

ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা

"ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী" পরিত্যাগের পর ভবানীচরণ হায়দ্রাবাদে একটি বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন। ঐখানে তিনি এক প্রার্থনা সভা স্থাপন করেন। সিন্ধী যুবকদের অনেকেই ওখানে আসতেন। নিয়মিত আগন্তুকের মধ্যে ছিলেন লেকরাজ, ক্ষেমচাঁদ ও পরমানন্দ্। ছাত্র বয়সে ক্ষেমচাঁদ ও পরমানন্দ্ যুক্তিবাদী ও নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু ভবানীচরণের ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা ক্রমশ ধর্মভীরু ও খৃষ্টধর্মানুরাগী হন। তাঁরা তখন উভয়েই "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"তে শিক্ষকতা করতেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই সব মতিগতি

* (২৮) *The Blade*, p. 40

সুনজরে দেখলেন না। এই সময় খৃশ্চিয়ানিটি বা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য শিকারপুরের জেলা-জজ দিওয়ান দয়ারামকে আমন্ত্রণ করা হলো। তিনি "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"তে সর্বসমেত ষোলটি বক্তৃতা দিলেন। সর্বশেষ বক্তৃতা হয় শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক সম্বন্ধে। বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের উপর যুক্তি-বাদের ভূমি থেকে আক্রমণ চালানো হলো ও সর্বশেষে প্রদর্শিত হলো যীশুখৃষ্টের তুলনায় গুরু নানকের উন্নততর চরিত্র। ক্ষেমচাঁদ ও পরমানন্দ্ দিওয়ান দয়ারামের ধর্ম আলোচনায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং দিন কয়েক বক্তৃতা শোনার পর দয়ারামের বক্তৃতা শোনাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু ঐ সকল বক্তৃতা সে সময় হায়দ্রা-বাদে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ তাঁর "ব্লেড্" বইয়ে (পৃঃ ৪৩) লিখেছেন যে, দয়ারামের বক্তৃতাবলী শ্রবণ করে যেমন কেহ কেহ পূর্বের থেকেও বেশি খৃষ্টনিষ্ঠ হলেন, তেমনি আবার কেহ কেহ প্রবল খৃষ্টধর্ম-বিরোধী হলেন। আবার অনেকে গ্রহণ করলেন অজ্ঞাবাদের (agnosticism-এর) পথ। সাধু হীরানন্দ স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে-নবচিন্তার প্রবাহ হায়দ্রাবাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তা রোধ করতে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই চিন্তা সংঘর্ষের পটভূমিতেই ভবানীচরণ খৃষ্টধর্মের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পরিশেষে তিনি ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ সনে হায়দ্রাবাদে অ্যাংলিকান চার্চের রেভারেণ্ড হীটনের (Rev. Heaton) দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। অ্যাংলিকান চার্চের পাদ্রীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও তিনি নিজেকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বলতে গররাজি হলেন, এমন কি অ্যাংলিকান চার্চের বাহ্য রীতিনীতি, আদব-কায়দাও তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর পিতৃব্য রেভারেণ্ড কালীচরণের মত তাঁরও ধারণা ছিল এই যে, ভারতীয় খৃষ্টভক্তেরা

স্বদেশের মঙ্গলার্থে এদেশে গড়ে তুলবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয় চার্চ। খৃষ্টপ্রীতির আতিশয্যে তাঁর দেশাত্মবোধ দুর্বল হলো না। যেদিন তিনি খৃষ্টধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, সেই রাত্রেই লোকগণনার কাজে অনুসন্ধানরত সরকারী কর্মচারী 'তিনি রোমান ক্যাথলিক না প্রোটেষ্টাণ্ট' জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, "আমি কোনটাই না। আমাকে ভারতীয় ক্যাথলিক বলে লিখে রাখুন" ("Put me down as an Indian Catholic") * (২৯)। অ্যাংলিকান চার্চ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত চার্চ, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একতিয়ায় বা কর্তৃত্ব তিনি পছন্দ করতেন না। তাছাড়া, প্রবোধচন্দ্র সিংহের মতে, এদেশে প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মেব মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করে ভবানীচরণ খৃষ্টধর্মের উক্ত শাখায়ও শান্তিলাভ করলেন না। পরিশেষে করাচী সহরে থাকাকালীন তিনি ঐ বৎসরই ১লা সেপ্টেম্বর ফাদার থিওফিলাস্ পেরিগের (Theophilus Perrig) দ্বারা যথারীতি রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন, এবং নিজেও "থিওফিলাস্" এই খৃশ্চান নাম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্মের অনুশীলনকালে তিনি সেণ্ট্ থিওফিলাসের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। থিওফিলাস একটি গ্রীক শব্দ, এর আক্ষরিক অর্থ 'ব্রহ্মবন্ধু' (lover or friend of God)। সাধু থিওফিলাসকে ভবানীচরণ ব্রহ্মবান্ধব বলে অভিহিত করতেন * (৩০)। থিওফিলাস ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান সাধু। তিনিই নাকি খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে "ট্রিনীটি" (Trinity) তত্ত্বের প্রবর্তন করেন।

* (২৯) *The Blade*, p. 44

* (৩০) B Animananda's *Swami Upadhyay Brahmabandhav*, Part I, p. 15

ভবানীচরণ চাইলেন তিনিও খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে হিন্দুঋষিদের ত্রিনীতি-তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দের মন্ত্র—উচ্চারণ করবেন। তাই তিনি থিওফিলাস নাম গ্রহণ করলেন। তিনি খৃষ্টধর্মের অনুসরণকারী হয়েছিলেন কোনো সাময়িক খেয়াল বা উত্তেজনার বশে নয়। গভীর অনুশীলন ও অনুধাবনের পরই তিনি ঐ পথে গমন করেছিলেন। সাংসারিক লাভ-লোকসানের হিসাবে এতে তাঁর দুঃখের বোঝা বেড়েছিল বই কমে নি। তাঁর বন্ধুদের ভাগ্যেও তদ্রূপ।

ভবানীচরণের সংস্পর্শে ক্ষেমচাঁদ ও পরমানন্দ ক্রমশই খৃষ্টভক্ত হয়ে উঠলে তাঁদের আচরণ নিয়ে "ইউনিয়ান অ্যাকাডেমী"র কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রশ্ন ওঠে। তাই তাঁরাও ধর্মকে বড় জ্ঞান করে' ঐ বিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগ করেন ও অল্পদিন পরই ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন। এর বৎসর দুই পরে সিন্ধুদেশীয় রেবাচাঁদও—যিনি পরে অণিমানন্দ নামে পরিচিত হন তিনিও—ভবানীচরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন (২৯শে মে, ১৮৯৩)।

ভবানীচরণ সিন্ধুদেশের যুব সমাজের উপর গণনীয় রেখাপাত করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকলে ও পরপর কয়েকটি সিন্ধী যুবক খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করলে সেখানে তীব্র আলোড়ন দেখা দেয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভবানীচরণের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। হায়দ্রাবাদে তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন তাঁর মালিক ছিলেন একজন হিন্দু। ভবানীচরণকে সেই হিন্দু বাড়ী থেকে উৎখাত করা হলো। অগত্যা তিনি এক মুসলমানের বাড়ীতে এবং পরে এক ইয়ুদীর বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষেমচাঁদের পিতা তাঁকে একেবারে মেরে ফেলবেন বলে ভয় দেখালেন, পরমানন্দের মা শোকে-দুঃখে কিছুদিন অন্নগ্রহণেও নিবৃত্ত

হলেন। রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে তাঁদের উদ্দেশে নানারূপ গালি এমন কি ইষ্টকখণ্ডও বর্ষিত হতো। পিতামাতারা যুবকদের বারণ করে দিলেন ভবানীচরণের ত্রিসীমানাতেও না ঘেঁষতে। একবার করাচীতে তিনি ও তাঁর খৃষ্টান বন্ধুরা এক সভায় বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হলে জনতার চিৎকার-চেঁচামেচিতে তাঁদের বক্তৃতা-দেওয়া পণ্ড হয়। কিন্তু ধর্মানুপ্রাণিত ব্যক্তিকে কখনও কোনো প্রতিকূলতা তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এইভাবে বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ভবানীচরণের আদর্শনিষ্ঠা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সন্ন্যাস গ্রহণ

ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পর ভবানীচরণের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো করাচী ও হায়দ্রাবাদ। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো ক্যাথলিক ধর্মের দিকে ভারতবর্ষকে আকর্ষণ করা। করাচী সহরে ধর্ম আলোচনার জন্য তিনি একটি সমিতি স্থাপন করলেন এবং ধর্ম বিষয়ে পুস্তকাদি লিখতেও ব্রতী হন। এই সময় তিনি "Was Luther a Reformer?"(১৮৯২) ও "A Tract on the Existence of God" (১৮৯৩) নামক দুই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পুস্তিকা দুটি যথাক্রমে ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সমালোচক ও সিন্ধী নাস্তিক্যবাদীদের উদ্দেশে লিখিত হয়েছিল। ভবানীচরণের ধর্মজীবন সংগ্রামের ইতিহাস। সাংসারিক প্রলোভন বা সাময়িক সুবিধার হিসাব তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে এতটুকুও প্রভাবিত করেনি। অন্তরের গভীরে যা সত্য বলে তিনি অনুভব করতেন, তারই অকুণ্ঠ প্রকাশ থাকতো তাঁর রচনায় ও বক্তৃতায়। এই সময় ক্যাথলিক ধর্মমত প্রচারের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলেন (ডিসেম্বর,

১৮৯৪)। এখন তিনি গৈরিক বসনধারী সর্বত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করতে লাগলেন। গৃহস্থাশ্রমের নাম—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিত্যক্ত হলো। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নতুন নাম নিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবন্ধু বা ব্রহ্মবান্ধব। সে-সময় তিনি করাচী সহর থেকে ক্যাথলিক চার্চের 'সোফিয়া' (Sophia) নামক মাসিক পত্র সম্পাদনা করতেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম গ্রহণ প্রসঙ্গে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঐ পত্রে তাঁর একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হলো * (৩১)। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী বেশে এবার ধর্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করলেন। ক্যাথলিক চার্চের অনেকে উপাধ্যায়ের এই হাবভাব সুনজরে দেখলেন না, তারা মনে করলেন অজ্ঞ ও সরলপ্রকৃতি হিন্দুদের ক্যাথলিক ধর্মে আকৃষ্ট করবার সহজ পন্থা হিসাবেই তিনি এ পথ গ্রহণ করেছেন। তাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী থেকে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সময় উপাধ্যায় তাঁর বুকের উপর খৃষ্টধর্মের প্রতীক-চিহ্ন "ক্রস্"ও (Cross) ধারণ করতেন। কিন্তু তবুও তাঁর বিরুদ্ধে বিপক্ষীয়দের জল্পনা-কল্পনা বন্ধ হলো না।

* (৩১) "I have adopted the life of *Bhikshu* (mendicant) *Sannyasi.* The practice prevalent in our country is to adopt a new name along with the adoption of a *religious* life. Accordingly I have adopted a new name. My family surname is *Vandya* (praised) *Upadhyaya* (teacher, lit. sub-teacher), and my baptismal name is *Brahmabandhu* (Theophilus). I have abandoned the first portion of my family surname, because I am a disciple of Jesus Christ, the Man of Sorrows, the *Despised* Man. So my new name is Upadhyaya Brahmabandhu. I hereby declare that, henceforward, I shall be known and addressed as Upadhyaya Brahmabandhu, or, in short, Upadhyayji, and not Banerji, which is an English corruption of the first portion of my family surname. *Vandya-ji.*" এই ঘোষণাপত্রটি 'সোফিয়া' পত্রের ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সনের সংখ্যায় (পৃঃ ১) প্রকাশিত হয়েছিল।

'সোফিয়া' পত্রের সম্পাদনা

১৮৯৪ সন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে এক স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরের জানুয়ারী মাসে তাঁর উৎসাহে ও সম্পাদনায় করাচী সহরে ক্যাথলিক চার্চের মুখপত্র হিসাবে 'সোফিয়া' (Sophia) নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পত্রিকা ১৮৯৯ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত চলেছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তিনি এর উদ্দেশ্যাবলী ঘোষণা প্রসঙ্গে লিখলেন মানব জীবনের চরম পরিণতির স্বরূপ সন্ধান ও উপায় নির্ধারণ, ভারতবাসীর সামনে বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদির মূল বক্তব্যগুলি যথাযথভাবে উদ্ঘাটন, যীশুখৃষ্ট প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক চার্চের ধর্মসূত্রগুলির বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনা-সাধন এবং ভারতবর্ষের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা এই পত্রিকার লক্ষ্য * (৩২)। এই উদ্দেশ্যাবলীর ঘোষণা থেকে দুটি সত্য বস্তু পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করে পারে না—তা' হলো উপাধ্যায়ের (তখনও তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত) গভীর ক্যাথলিক প্রীতি এবং গভীর দেশাত্মবোধ বা ভারতপ্রীতি। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন স্বদেশকে বিস্মৃত হয়ে বা উপেক্ষা করে নয়, বরং তাঁর ভারতপ্রীতির মানসিক পটভূমিতেই তিনি জীবনে ক্যাথলিক ধর্ম স্বীকার করেছিলেন। তাই দেখি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পরও তিনি ভারতবিদ্বেষী হলেন না, তিনি গ্রহণ করলেন হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিক বসন। তিনি ভারতবর্ষকে বিশুদ্ধ ক্যাথলিক ধর্মাদর্শে (চার্চ-শাসিত ধর্মাদর্শে নয়) অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ সেই

* (৩২) *Sophia*, January, 1894, p. 1

অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে ভারতের হবে আর্থিক-পারমার্থিক পুনরুজ্জীবন। ভারতের মুক্তি, ভারতের কল্যাণ চিন্তা থেকে তিনি কখনও বিরত হন নি। তিনি ক্যাথলিক ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন সে প্রশ্ন ইতিহাসে গৌণ। তাঁর জীবনের সব থেকে বৃহৎ বস্তু হলো তীব্র দেশাত্মবোধ। এই স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে না রাখলে উপাধ্যায়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে সাধু সন্ন্যাসীর অভাব কোনদিনও ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দকে বাদ দিলে উপাধ্যায় সদৃশ স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসী সেকালে অদ্বিতীয়। ক্যাথলিক চার্চের মুখপত্র 'সোফিয়া' পত্রিকা পরিচালনাকালেও তাঁর ভারতগত প্রাণ নিষ্ক্রিয় ছিল না। ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তন তাঁর স্বাদেশিকতাকে বিনষ্ট করে নি। বরং পরকীয়া ধর্মের সংস্পর্শে ও অনুশীলনে তিনি স্বধর্মের স্বরূপ আরও পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

'সোফিয়া' পত্রের আলোচনা প্রণালী প্রসঙ্গে উপাধ্যায় লিখলেন যে, অনেকে হয়ত আশঙ্কা করছেন যে পর ধর্ম আলোচনার নামে আসলে এই ক্যাথলিক পত্রিকায় ক্যাথলিক ধর্মেরই জয়গান কীর্তিত হবে, অন্যান্য ধর্মমত পাবে না তেমন শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। তিনি লিখলেন, এ আশঙ্কা অমূলক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় কোথাও ঘটনার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি করা হবে না, সত্যনিষ্ঠ মেজাজেই ধর্মালোচনা চালোনো হবে, এবং প্রত্যেক ধর্মের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য যথাসম্ভব সঠিকভাবে প্রদর্শিত হবে। কিন্তু যে ধর্মের যেখানে দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা তা প্রকাশ করতেও আমরা দ্বিধা বোধ করবো না। রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা পত্রিকার গণ্ডীবহির্ভূত বলে ঘোষিত হলো * (৩৩)।

* (৩৩) *Sophia*, January, 1894, pp. 1-2

যে মহৎ আদর্শ নিয়ে এই পত্রিকা স্থাপিত হলো, বাস্তবক্ষেত্রে সে আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পালিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

জীবনের এই পর্বে উপাধ্যায়ের মন খৃষ্টধর্মের ভাবে এতই বিভোর ছিল যে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা দেখাতে পারেন নি। তখন তাঁর বিশ্বাস হলো যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ ঈশ্বরবাদের (Theism) সুমহান্ আদর্শ এই ধর্মে যেমন স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে তেমন আর কোনো ধর্মে হয়নি। তিনি মনে করলেন হিন্দুজাতির বৈদিক ধর্ম ঈশ্বরের একত্বের বদলে বহুত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তিনি এখন কিছুদিন "ঘোর বেদান্ত-বিদ্বেষী" হয়ে পড়লেন এবং 'সোফিয়া' পত্রে নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বেদান্তের তুলনায় ক্যাথলিক ধর্মের উন্নততর রূপ প্রদর্শন করে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে এই সময় যে নবহিন্দুধর্ম ও বেদান্ত আন্দোলন এদেশে দেখা দেয় তার উপরেও তিনি কঠোর সমালোচনা ও শ্লেষ প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হলেন না * (৩৪)। ১৮৯৭ সনে তিনি ঐ পত্রে এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক আসন্ন সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, অ্যানি বেসান্ত্ ও স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুদ্ ও ভ্রমাত্মক ধর্মব্যাখ্যা সারা দেশটাকে অন্ধকার ও অবনতির দিকে, দারুণ দুঃখও দুর্দশার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে * (৩৫)। সেই দুর্যোগ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারে

* (৩৪) *Sophia*, February, 1897, pp. 4 and 11

* (৩৫) ১৮৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে "The Impending Crisis—An Appeal" প্রবন্ধে উপাধ্যায় লিখলেন, "The wells of religious thought in India have

একমাত্র ক্যাথলিক চার্চ তার পবিত্র ধর্মপ্রচারের দ্বারা। ১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসে "রামকৃষ্ণ কে?" (Who was Ramkrishna?) নামক এক প্রবন্ধে তিনি লিখলেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইয়েরা ঈশ্বরের অবতার বলে লোকচক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁরা মনে করেন রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মত রামকৃষ্ণও পূর্ণ অবতার। উপাধ্যায় বিদ্রূপাত্মক সুরে মন্তব্য করলেন যে, রামকৃষ্ণ অবতার কিনা এ প্রশ্ন সম্বন্ধে খুব বেশি গুরুত্ব দেবার দরকার নেই, কারণ এদেশের জনসাধারণ অতি-সাধারণ লোককেও দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করতে অভ্যস্ত। তারা আগেও এরকম বহু অবতার বানিয়েছে। মানুষকে অবতার বানানো এদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজেই এখন রামকৃষ্ণকে তারা অবতার বলে খাড়া করলে ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু যা পরিতাপের বস্তু তা হলো, এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের অন্ধতা ও গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি, কিন্তু তাই বলে তাঁকে অবতার বলে প্রচার করা কুসংস্কারপূর্ণ বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয় * (৩৬)।

been deeply poisoned and it is only a question of time for doctrines destructive of the very foundations of religion and morality to deluge the land and ruin its fairest prospects, plunging countless millions into abysses of misery here and hereafter. It is a great crisis in the history of India" (p. 11). এই প্রসঙ্গে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ সনের 'সোফিয়া' পত্রও (পৃষ্ঠা ৩) দ্রষ্টব্য।

* (৩৬)। "Now Svami Vivekanand and his disciples are attempting to add one more such incarnation to the already overcrowded Hindu pantheon. They say that Ramkrishna was as full an *avatar* as Ram and Krishna. It does not matter much if the masses in India to whom every trickster or conjuror of a *guru* is an incarnation, place Ramkrishna on their rudely-carved low pedestal assigned to a

সোফিয়া পত্রে উপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকদের উদ্দেশেও সমালোচনা বর্ষণ করলেন। হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন এই সময় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে সেখানকার ব্রাহ্মনেতাগণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারের গতি রোধ করবার জন্য তাঁরা খৃষ্টধর্মবিদ্বেষী মিঃ ভয়সির (Voysey) সঙ্গে ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে মিতালি স্থাপন করেন। ভয়সি ছিলেন তীব্র খৃষ্টধর্মবিরোধী। ব্রাহ্মরা এতদিন তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের কুৎসাকারী (Vilifier of Christ) বলে জ্ঞান করতো। কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত ব্রাহ্মধর্মে যীশুখৃষ্টের মাহাত্ম্য যেভাবে ঘোষিত হতো তাতে অনেকের সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কেশব-প্রচারিত ধর্মাদর্শই ব্রাহ্মদের মনে খৃষ্টধর্মের অনুকূলে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে। হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মনেতারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এখন তাঁদের ধর্মপ্রচারে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। খৃষ্টান ধর্ম-ঘেঁষা ব্রাহ্মধর্মকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টতত্ত্ব বর্জিত করবার উদ্দেশ্যে এখন হাত মিলালেন ভয়সির সঙ্গে, যে ভয়সি তাঁদের গুরু কেশবচন্দ্রকে উন্মাদ ব্যক্তি বলেছিলেন* (৩৭)। উপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভয়সির মতামতের অসারতা প্রদর্শন করে হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মদের উদ্দেশে লিখলেন যে, যখন এক

thousand and one divinities and worship as one of them. What we deplore is the blindness of educated men who are disfiguring and debasing such a good and great soul as that of Ramkrishna by their foolish attempt to deify him…" ১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসের 'সোফিয়া' পত্র (পৃষ্ঠা ৯-১১) দ্রষ্টব্য।

* (৩৭) 'সোফিয়া' পত্রে (আগষ্ট, ১৮৯৫) "Mr. Voysey and Brahmos of Hyderabad (Sindh)—An Unholy Alliance" প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ৫-৯) দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রবন্ধটি "A Quondam Brahmo" এই ছদ্মনামে বের হয়েছিল।

অন্ধ আর এক অন্ধ দ্বারা চালিত হয় তখন পরিণাম হয় ভয়াবহ* (৩৮)।

কিন্তু 'সোফিয়া' সম্পাদকের সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ বর্ষিত হলো তৎকালীন আর্য সমাজীদের ও থিওসফিষ্টদের উপর। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ঊনবিংশ শতকে এদেশে আক্রমণাত্মক হিন্দুধর্মের তিনি অন্যতম প্রধানতম উদ্গাতা। বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি ভারতকে প্রাচীননিষ্ঠ ও শক্তিযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মের ঘোর বিরোধী। তাই তাঁর প্রচারিত মতবাদকে খণ্ডন করতে উপাধ্যায় যত্নবান হলেন। থিওসফিষ্টদের সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ অনুরূপ। বিগত শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষে থিওসফিষ্ট আন্দোলন মিসেস্ অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে দ্রুতবেগে দানা গেঁথে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবকীর্তন ও তার পুনরুজ্জীবন এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। ১৮৯৩ সনে অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ও ভারতীয় সংস্কৃতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দেন। ভারতীয়দের অন্তরে জাতীয় সত্তা বিকাশের অনুকূল আদর্শনিষ্ঠা ও আত্ম-প্রত্যয় সঞ্চার করতে অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে তুলনীয় মানুষ তৎকালে এদেশে খুব অল্পই ছিলেন* (৩৯)। উপাধ্যায় অ্যানি বেসান্ত প্রচারিত ব্রহ্মবিদ্যা ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত

* (৩৮) উক্ত প্রবন্ধে উপাধ্যায় লিখলেন, "Brahmos of Hyderabad! Beware! ...The end is always fatal when a blind man places himself under the guidance of another blind man" (p. 9). এই প্রসঙ্গে 'সোফিয়া' পত্রে "Vain Hopes of a Brahmo Paper" প্রবন্ধ (মার্চ, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ৩৭) দ্রষ্টব্য।

* (৩৯) *The Growth of Nationalism in India*, pp. 117-120

হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা একান্ত ভ্রমাত্মক বলে বিবেচনা করলেন। তাই উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে নানা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে থিওসফিষ্ট আন্দোলনের অসারতা ও আর্য সমাজের ভ্রমাত্মক রক্ষণশীলতাকে কঠোরভাবে আঘাত করতে লাগলেন* (৪০)।

উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে যে সকল দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন তা শুধু পরধর্ম সমালোচনাতেই নিযুক্ত হলো না। ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের মহিমা ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করেও তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধগুলিতে সাধারণত তাঁর নামের স্বাক্ষর থাকতো না। তবে মাঝে মাঝে "A Quondam Brahmo" এই ছদ্মনামে তাঁর রচনা বের হতো। এই পত্রিকা পরিচালনাকালে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত রেভারেণ্ড এ. হেগ্‌লিন্‌ (Rev. A. Hegglin) তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর লেখা বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'সোফিয়া' পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনিও মাঝে মাঝে পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন।

'সোফিয়া' পত্রের রচনাবলী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপরেও ঐ পত্রিকায় অনেক সারগর্ভ রচনা বের হয়েছিল। তাছাড়া, মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ "A Survey of the Religious Movements of New

* (৪০) 'সোফিয়া' পত্রে "Theosophy Dissected" (মে, ১৮৯৫), "An Open Letter to Mrs. Annie Besant" (নবেম্বর, ১৮৯৫), "Liberalism in Belief or What Say Swami Vivekananda, Mrs. Annie Besant, and their Disciples?" (ডিসেম্বর, ১৮৯৫—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬), "The Niyoga Doctrine of the Arya Samaj" (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮) প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

India" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) নাম করা চলে। ঐ দুই প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য সমাজের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

উপাধ্যায়ের প্রচার-বক্তৃতা

'সোফিয়া' পত্র সম্পাদনা কালে উপাধ্যায় শুধু প্রবন্ধ রচনাতেই ব্যাপৃত থাকলেন না, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নানাস্থান পর্যটন করে বক্তৃতাবলীও প্রদান করতে লাগলেন। ১৮৯৪ সনের অক্টোবর মাসে তিনি আর্য সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র লাহোর সহরে এক বক্তৃতায় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দয়ানন্দ সরস্বতীর ধারণাকে খণ্ডন করতে প্রবৃত্ত হন। ঐ বৎসরই নবেম্বর মাসে তিনি লাহোরে "মানুষের শেষ পরিণতি" (The End of Man) সম্বন্ধে এক তীব্র বিতর্কমূলক বক্তৃতা প্রদান করে আর্য সমাজের নেতাদের তিনি তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মানুষের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান জানান। এই সময় তাঁর সঙ্গে আর্য সমাজীদের যে আদর্শগত-সংঘাত উপস্থিত হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় 'সোফিয়া' পত্রের ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সনের সংখ্যায়।

১৮৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনের অনুকরণে আজমীর সহরে এক ক্ষুদ্রাকার ধর্ম সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ক্যাথলিক ধর্মের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য উপাধ্যায়ও আমন্ত্রিত হলেন। সেখানে তিনি দুটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

উপাধ্যায় ও অ্যানি বেসান্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত থিওসফিষ্ট আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড়

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী বেসান্তের ব্যাখ্যা তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর প্রচারিত ধর্মব্যাখ্যাকে তিনি মহামারীর (plague) সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই মহামারীর কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে। তাই দেখি এই সময় তাঁর তীব্রতম আক্রমণের লক্ষ্য হলো বেসান্ত পরিচালিত ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলন। ১৮৯৫ সনের মে মাসে তিনি 'সোফিয়া' পত্রে শ্রীমতী বেসান্তের উদ্দেশে এক খোলা চিঠি লিখলেন ও বেসান্তকে আহ্বান জানালেন ধর্ম বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে। কিন্তু বেসান্ত সে আহ্বানে সাড়া দিলেন না। উপাধ্যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবার পাত্র নন। তিনি অ্যানি বেসান্তের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এবার প্রকাশ্যে আবির্ভূত হলেন। যেখানেই বেসান্ত গমন করেন সেখানেই তিনি ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। বেসান্ত বক্তৃতা করতে গমন করেন উপাধ্যায়ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। মাদ্রাজ, বম্বে, লাহোর, করাচী, সুক্কুর ও হায়দ্রাবাদ (সিন্ধুদেশীয়) প্রভৃতি স্থানে তিনি থিওসফি বা ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতা পর্যটন সুরু হয় ১৮৯৬ সনে। প্রথমে তিনি বম্বে সহরে চারিটি বক্তৃতা দিলেন (মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৬)। তাঁর তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল "আদি পরব্রহ্ম ও শ্রীমতী বেসান্তের ভগবান"। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান প্রতিনিধি এন, জি, চন্দ্রভারকার। যুক্তিনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে উপাধ্যায় প্রদর্শন করে দেখালেন যে, কি ভাবে বেসান্ত হিন্দুধর্মের গৌরব কীর্তনের নামে বেদ-উপনিষদের সূত্রগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষের সর্বনাশ

করতে চলেছেন * (৪১)। ঐ বক্তৃতা প্রদান করা হয় ২৫শে মার্চ, ১৮৯৫ সনে। এর এক সপ্তাহ পরে (১লা এপ্রিল) তিনি মহাদেব গোবিন্দ্ রাণাডের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় চতুর্থ বক্তৃতাটি প্রদান করেন। বিষয়বস্তু ছিল "অন্ত ও অনন্ত" (The Infinite and Finite)। ক্যাথলিক ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য মনোজ্ঞ ভাষায় শ্রোতাদের বুঝানো হলো। বক্তৃতাটি এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, বক্তৃতা শেষে জাষ্টিস্ রাণাডে আনন্দের সঙ্গে বল্‌লেন, এই যদি হয় ক্যাথলিক ধর্ম তা' হলে ঐ ধর্ম গ্রহণ করতে আমার কিছুমাত্রও দ্বিধা নেই* (৪২)। বম্বের প্রার্থনা সমাজের মুখপত্র 'সুবোধ পত্রিকা' অ্যানি বেসান্তের কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করলো যে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বাস্তবিকই শ্রীমতী বেসান্তের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা আশা করি তিনি এভাবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে দেশের পরম হিতসাধন করবেন * (৪২ ক)। বম্বে থেকে প্রকাশিত ক্যাথলিক এক্‌জামিনার (*Catholic Examiner*) পত্রিকার রিপোর্ট থেকেও বুঝা যায় বম্বেতে উপাধ্যায়ের বক্তৃতা কী বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিল। গৈরিক বসন পরিহিত ক্যাথলিক

* (৪১) *Sophia*, April-May, 1896
* (৪২) *The Blade*, p. 63
* (৪২ ক) "We may console ourselves with the fact that Mrs. Besant has had a very powerful opponent in Upadhyaya Brahmabandhav. He too has been delivering lectures in which he exposed the true nature of the Theosophic movement. He (a Roman Catholic) is a staunch believer in the 'Personal God'···We hope Mr. Brahmabandhav will deliver similar lectures to his brethren all round India, and thereby do signal service to his mother country···" 'সুবোধ পত্রিকা'র এই অভিমত জুন, ১৮৯৬ সনের 'সোফিয়া' পত্রে (পৃষ্ঠা ২৬) উদ্ধৃত হয়েছিল।

সন্ন্যাসীর আগমনে বম্বে সহরে সেদিন যথেষ্ট সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বম্বে বক্তৃতাবলীর পর উপাধ্যায় অল্পসময়ের জন্য আরও দক্ষিণে ত্রিচিনপলিতে গমন করেন এবং সেখানে 'সেণ্ট্ যোশেপ্স্ কলেজে' ও টাউন-হলে দুটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তারপর তিনি আবার করাচীতে ফিরে আসেন। ঐ বৎসরের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তাঁর বেসান্ত-বিরোধী প্রচারকার্য উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করে। লাহোরে অ্যানি বেসান্ত থিওসফির প্রচারকার্য চালাতে শীঘ্রই উপনীত হবেন শুনতে পেয়ে উপাধ্যায় আগে থেকেই সেখানে এসে হাজির হলেন (নবেম্বর, ১৮৯৬)। উদ্দেশ্য হলো সেখানে থিওসফিষ্ট আন্দোলনের গতিকে প্রতিরোধ করা। লাহোরে তিনি দুটি স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় বক্তৃতাতেই তিনি শ্রীমতী বেসান্ত প্রচারিত মতবাদের উপর আক্রমণ চালালেন * (৪৩)। লাহোর থেকে এবার তিনি প্রত্যাগমন করলেন করাচীতে (ডিসেম্বর, ১৮৯৬)। অ্যানি বেসান্ত তখন সিন্ধুদেশে প্রচারোদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। করাচীতে তিনি দুটি বক্তৃতা দেবেন বলে ইতিপূর্বেই পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন মারফৎ ঘোষিত হয়েছিল। উপাধ্যায়ও তার পাল্টা দুটি বক্তৃতা দেবেন বলে সাড়ম্বরে প্রচারিত হলো। করাচী সহরে সেদিন এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও সাড়া পড়ে গেল। সেখানকার বিখ্যাত 'ম্যাক্স্-ডেন্সো হলে' (Max-Denso Hall-এ) ১০ই ডিসেম্বর শ্রীমতী বেসান্ত "থিওসফি" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা দিলেন। ঠিক পরদিন (১১ই ডিসেম্বর) ঐ হলেই উপাধ্যায়ের প্রথম পাল্টা

* (৪৩) *Sophia*, December, 1896, pp. 14-16

বক্তৃতা প্রদত্ত হলো। উপাধ্যায় দেখালেন যে হিন্দুধর্মের ঈশ্বর আর থিওসফিষ্টদের ঈশ্বর এক বস্তু নন। অ্যানি বেসান্ত ঈশ্বরের যে-ধারণা প্রচার করছেন, সে-ঈশ্বর নেতি-বাচক, কিন্তু হিন্দুধর্মের ঈশ্বরের স্বরূপ "সচ্চিদানন্দ"। এরপর বেসান্ত দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান কালে তাঁর ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর সমালোচনার জবাব দিলেন। তৎপর আবার উপাধ্যায় দিলেন আর এক বক্তৃতায় তার পাল্টা জবাব। এই বাদানুবাদ, উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকলে উপাধ্যায়ের সঙ্গে বেসান্তের একদিন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সোফিয়া' পত্রে এখনও দেখতে পাওয়া যায় * (৪৩ ক)। ঐ বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতাবলী ও তাঁর মুখে হিন্দুধর্মের গুণকীর্তন শ্রবণ করে সিন্ধুদেশের বহু লোক থিওসফিষ্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হলো বটে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের মনে উপাধ্যায়ের বক্তৃতাবলীও কম রেখাপাত করে নি। অ্যানি বেসান্তের তুলনায় উপাধ্যায়কে অনেক বেশি প্রতিকূলতার সামনে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অ্যানি বেসান্ত ছিলেন হিন্দুধর্মের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ, উপাধ্যায় রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচার তাঁর নেশা! উপাধ্যায়ের খৃষ্টপ্রীতির আতিশয্য সিন্ধুদেশীয় শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ মোটেই সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা উপাধ্যায় ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত রাখবার উদ্দেশ্যেই অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করেছিলেন। বেসান্তের মুখে হিন্দুধর্মের অকৃপণ ও উদার প্রশংসা শ্রবণ করে সিন্ধুদেশের বহু লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বিরত হয়েছিল।

* (৪৩ ক) *Sophia*, January, 1897, pp. 12-14

বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাও কিছু বলা প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হতে আরম্ভ করে, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'সোফিয়া' পত্রে যে সময় উপাধ্যায় ক্যাথলিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করে প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন, ঠিক সেই সময়েই বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মুল্লুকে একটা বিপরীতমুখী আন্দোলন—বেদান্ত আন্দোলন সুরু হয়। তার ঢেউ ভারতের মানসতটভূমিতে এসে ভেঙে পড়লো। ১৮৯৩ সনে শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের সাফল্যে ভারতবাসী অনুভব করলো ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির দিগ্বিজয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশে ও সংগঠনে স্বামিজী শক্তিযোগের মন্ত্র সে সময় প্রকাণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম ১৮৯৬ সন থেকে তাঁর যোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের পরিচালনায় পাশ্চাত্যে দৃঢ়ীভূত ও বিস্তৃত হতে থাকে * (৪৪)। পাশ্চাত্যদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ক্রমিক বিস্তৃতি ও সাফল্য ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। একদিকে অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত থিওসফিষ্ট আন্দোলন, আর একদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন উভয়ে মিলিত ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বাজাত্যবোধকে তীব্রতর করে তোলে। হিন্দুধর্মানুরাগী এই আন্দোলন সারা ভারতে ক্রমশই এমন প্রভাব বিস্তার করে যে উপাধ্যায় এর গতিকে রোধ করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। বিরুদ্ধ

* (৪৪) *The Growth of Nationalism in India*, pp 111-120

ধর্মমতের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হতে লাগলো।

সেবাব্রতী উপাধ্যায়

১৮৯৭ সনের গোড়ার দিকে সিন্ধুদেশে এক ভয়ানক প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। করাচী সহরেও এর ভয়াবহ প্রকোপ দেখা দিল। "পল্লী, গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতে লাগিল। বাটীঘর শ্মশানে পরিণত হইল। এমন বাটী অবশিষ্ট রহিল না যে, সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিল না। গৃহস্বামী রোগাক্রান্ত স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। পুত্র মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন পিতামাতাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। লোকজনপূর্ণ অনেক বাটীরও এমন অবস্থা হইল যে, শেষে শব টানিয়া বাহির করিবার কেহ অবশিষ্ট রহিল না" * (৪৫)। এমন দুর্দিনে উপাধ্যায় আহার নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে দিনরাত অসহায় প্লেগরোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। উপাধ্যায়ের ক্যাথলিক শিষ্য দৌলত সিং রাম সিং সুক্কুরে প্লেগরোগীদের সেবাকার্যে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ক্যাথলিক চার্চের সন্ন্যাসিনিগণ এই সময় যে সেবাপরায়ণতার আদর্শ লোকচক্ষে তুলে ধরেন, তা সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

বম্বে সহরে প্লেগ-রোগীদের সেবাকার্য করতে করতে ভগিনী এলেজাবেথও প্রাণ হারালেন * (৪৬)। উপাধ্যায় এমনভাবে প্লেগরোগীদের সেবাকার্যে আত্মোৎসর্গ করলেন যে, তাঁর ক্যাথলিক বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই সরকারী ও বেসরকারী অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস

* (৪৫) প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" পুস্তক (পৃষ্ঠা ২৪-২৫) দ্রষ্টব্য
* (৪৬) *Sophia.*, June, 1897, pp. 13-15.

পেলো। কিন্তু উপাধ্যায় ঐ দুর্দিনে ত্যাগধর্ম ও সেবাধর্মের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা ভুলবার নয়। বহুসংখ্যক সিন্ধী নরনারী যোদ্ধাবেশী উপাধ্যায়ের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির যথার্থ পরিচয় পেলো। তাঁর যৌবনের সাধনভূমি ও কর্মভূমি সিন্ধুদেশ তাঁর বহু স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর সিন্ধুদেশীয় ক্যাথলিক শিষ্য, তাঁর জীবনীকার অণিমানন্দ লিখেছেন যে, উপাধ্যায় দশ বছর সিন্ধুদেশে ছিলেন এবং সেখানে তিনি যে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রেখে গেছেন তা মুছে ফেলবার নয়। ভবিষ্য ঐতিহাসিক আধুনিক সিন্ধুদেশের গঠন-কর্তাদের মধ্যে তাঁকে উল্লেখযোগ্য আসন প্রদান করবেন * (৪৭)।

বিবেকানন্দ-বিরোধী ব্রহ্মবান্ধব

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিবেকানন্দ-বেসান্ত পরিচালিত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন এদেশে বৃহৎ আকার ধারণ করলে উপাধ্যায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদের পরিচালনায় হিন্দুধর্মের যে রূপ প্রকটিত হতে লাগলো তাকে তিনি এই সময় নারকীয় ভ্রম (infernal error) বলে চিহ্নিত করলেন। ১৮৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 'সোফিয়া' পত্রে নবহিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকানন্দ ও বেসান্তের ধর্মমতের তীব্র সমালোচনা করে দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে এই মিথ্যা ও ভ্রমের প্রমাদ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য আহ্বান জানালেন। বাংলা দেশে ও মাদ্রাজেই যে শুধু বিবেকানন্দ-বেসান্তের প্রভাব

* (৪৭) "Upadhyayji worked for ten years in Sindh and has left an indelible mark behind him. The future historian will give him a conspicuous place among the makers of modern Sindh." (Vide B. Animananda's *Swami Upadhyay Brahmabandhav*, Part I, p. 22)

প্রবলভাবে কাজ করে চলেছে তা নয়, সেই প্রভাব পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতেও লক্ষণীয় হয়ে উঠ্‌ছে।

> "This is especially the case in Bengal and Madras, two of the most advanced provinces in India, and also in the N. W. Provinces. But even in the Punjab and Western India, though the degradation is not so complete, there is widespread sympathy with the general aims of Annie Besant's as well as Vivekananda's propaganda, and there is every danger that our people will be gradually seduced into these infernal errors."

উপাধ্যায় মনে করলেন এই আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করবার শক্তি ধারণ করে একমাত্র ক্যাথলিক চার্চ। তার শক্তি, সামর্থ্য ও সংগঠন অসাধারণ। বিদ্বান, চরিত্রবান, ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকদের আজ দলে দলে বের হয়ে ভারত পর্যটন করে সারা দেশে খৃষ্টধর্মের মহান আদর্শ তাঁদের প্রচার করতে হবে, এক 'কেন্দ্রীয় সংগঠনে'র অধীনে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়ে নয় * (৪৮)।

১৮৯৭ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে মাদ্রাজ, শ্রীরঙ্গম, ত্রিচিনপলী, পালমকোটা ও টুটিকোরিণে হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন * (৪৯)। ঠিক ঐ সময়েই 'সোফিয়া' পত্রেও তাঁর অনুরূপ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ "Neo-Hindu Dogmatism" (এপ্রিল, ১৮৯৭), "An Aspect of the Hindu Revival" (জুন, ১৮৯৭), "Hindu Idolatry and Catholic Image-Worship" (জুলাই,

* (৪৮) *Sophia*, February, 1897, p. 11

* (৪৯) *Sophia*, May, 1897, pp. 11-13

১৮৯৭) প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের তুলনায় খৃষ্টধর্মের গুণকীর্তন উচ্চৈঃস্বরে করা হলো। শুধু তাই নয়, পোপ ত্রয়োদশ লিও (Pope Leo XIII) বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মানব (The Greatest Man of our Time) বলে অভিনন্দিত হলেন* (৫০)। অক্টোবর মাসে "Who was Ramkrishna" প্রবন্ধে বিবেকানন্দী দলের উপর কশাঘাত করলেন। নবেম্বর মাসে বম্বেতে "হিন্দুধর্ম, ব্রহ্মবিদ্যা ও খৃষ্টতত্ত্ব" সম্বন্ধে তাঁর এক স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদত্ত হলো। বক্তৃতায় তিনি বললেন হিন্দু-জাতির ধর্মসাধনার সর্বোচ্চ আদর্শের সন্ধান খৃষ্টধর্মে পাওয়া যায়, থিওসফিতে নয় *(৫১)।

ক্যাথলিক ধর্মের ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা

১৮৯৭ সনের একেবারে শেষ দিকে উপাধ্যায় বম্বে থেকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক যুবক তাঁর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মতামত জানতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন। কলিকাতায় থাকাকালীন তিনি তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হলো অ্যাল্‌বার্ট হলে "বেদান্তের চরম তত্ত্ব" সম্বন্ধে। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "কর্মবাদ ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব", এবং তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "ব্রাহ্ম ধর্ম"* (৫২)। এইভাবে উপাধ্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে কলিকাতাবাসীর ধর্মমতকে

* (৫০) *Sophia*, July, 1897
(৫১) *Sophia*. December, 1897
(৫২) *Sophia*, May, 1898, pp. 75-78

প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি এই সময় বক্তৃতা ছাড়াও অন্যান্যভাবে—যেমন ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাৎ ও ঘরোয়া আলোচনার দ্বারা—অনেককে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হন। কলিকাতায় থাকাকালীন তাঁর সিন্ধুদেশীয় ক্যাথলিক শিষ্য রেবাচাঁদও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা করতাল হাতে নিয়ে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাংলা ও সংস্কৃতে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষান্বেষণে বের হতেন। কলিকাতার রাজপথে হিন্দুবেশী ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর সেই পদযাত্রা সেদিন বহুলোকের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল * (৫৩)।

ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর এই হিন্দুয়ানী কেন? এর সদুত্তর না পেলে উপাধ্যায়কে শুধু অসম্পূর্ণ বুঝা হবে তা নয়, তাকে ভুল বুঝা হবে। জন্মে ও বংশপরিচয়ে তিনি নিঃসন্দেহে হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু ধর্মভাবে ও আদর্শে তিনি রোমান ক্যাথলিক। তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু ধর্মসাধনার বহিরঙ্গে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গৈরিক বসন পরিহিত। রোমান ক্যাথলিকতা গ্রহণের সঙ্গে তিনি হিন্দুত্ব বিসর্জনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান বলে মনে করতেন না। তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি যে, তিনি ঐতিহ্যে ও কুলধর্মে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুসমাজের উদার বক্ষে নানা ধর্মমতপোষণকারী ও অনুসরণকারী, এমন কি বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ-ধর্মের অনুগামিগণও, মর্যাদার স্থান লাভ করে থাকেন। বৈষ্ণবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, অদ্বৈতবাদীও হিন্দু, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও হিন্দু, আস্তিকও হিন্দু, চার্বাকপন্থী নাস্তিকও হিন্দু। তাই ধর্ম-বিশ্বাসে ঈশাপন্থী হিন্দুও হিন্দু। কোনো বিশিষ্ট ধর্ম্মমত অনুসরণ করা বা না-করার উপর হিন্দুত্ব থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের শাসন, ঐতিহ্য ও দেশাচার পালন

* (৫৩) *The Blade*, p. 70

করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশিষ্ট ধর্মমত অনুসরণবশত কোন হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। তাই তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরও হিন্দুয়ানীর আদব-কায়দা বর্জন করলেন না। গৈরিক বসন পরিহিত ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর সঙ্কীর্তন বহু লোকের দৃষ্টিতে স্ব-বিরোধিতা এবং বিদ্রূপের বস্তু বলে প্রতীয়মান হলেও, উপাধ্যায়ের চিন্তাপ্রণালী অনুসারে এই দুই বস্তুর মিলনে কোন অন্তর্বিরোধ ছিল না* (৫৪)।

আরও একটা কথা। উপাধ্যায় জীবনের এই পর্বে মনে করতেন যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়েই ভারতের হবে পুনর্জন্ম ও পুনর্জাগরণ। তাই খৃষ্টধর্ম প্রচারে তাঁর এমন ঐকান্তিক আগ্রহ সেদিন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি ভুলতে পারেন নি যে, ভারতবর্ষ ইউরোপ নয়। ভারতবর্ষকে খৃষ্টধর্মের দিকে আকর্ষণ করতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কার ও সাধনার মধ্য দিয়েই করতে হবে, তাদের উৎপাটিত করে ত নয়ই, তাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়েও নয়। মাটিকে অস্বীকার করে আকাশে ওড়ার কল্পনাকে তিনি সায় দেন নি। ভূমির প্রাণরস থেকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত হলে বীজ কখনো মহীরুহতে পরিণত হয় না। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ না থাকলে কোনো ভাবাদর্শ স্থায়িত্ব লাভ করে না। এই গভীর দূরদৃষ্টি, এই অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন উপাধ্যায়। তাই দেখি হিন্দুসমাজকে খৃষ্টধর্মের ভাবাদর্শে প্রাণবন্ত করবার প্রচেষ্টায় তিনি সচরাচর দৃষ্ট মিশনারীদের মত কালা-পাহাড়ী দৃষ্টি নিলেন না। তিনি হিন্দুসমাজের গ্রহণযোগ্য খৃষ্ট-ধর্মের এক হিন্দুয়ানী গড়ন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এই নব-

* (৫৪) 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), বৈশাখ, ১৩০৮ সালের সংখ্যায় উপাধ্যায়ের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর জীবনে একদিন কত প্রবল হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী আজও অনেকটা অলিখিত।

ক্যাথলিক ধর্মের ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের এক স্মরণীয় কীর্তি। ১৮৯৪ সনের অক্টোবর মাসে 'সোফিয়া' পত্রে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় ক্যাথলিক বিশপগণের কর্তব্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলা—যে সংস্থার পরিচালনায় পরিব্রাজক ধর্মপ্রচারকগণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেন। তাঁদের চাল-চলন হবে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর মত। প্রয়োজন হলে তাঁরা হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গৈরিক বসন পরিধান করবেন এবং নিরামিষভোজী ও সম্পূর্ণভাবে পানাসক্তি থেকে মুক্ত হবেন। উপাধ্যায়ের বিশ্বাস ছিল এই যে সন্ন্যাসী প্রচারকেরাই ভারতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাই তিনি ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারকল্পে বিশপদের গৈরিক বসন পরিধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে দক্ষিণ ভারতে আগত ক্যাথলিক সাধু নোবিলির জীবনাদর্শ তাঁর চিন্তাকে আরও উদ্দীপ্ত করেতুলেছিল।

১৮৯৭ সনের জুলাই মাসে "হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টনীতি" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে উপাধ্যায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মধ্যযুগের ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব যেমন গ্রীক দর্শন গ্রহণ করে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছিল, তেমনি বর্তমানকালে ক্যাথলিক খৃষ্টতত্ত্বকে হিন্দু দর্শনের সহায়তায় প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। তিনি আরও লেখেন যে এই নীতি গ্রহণের উপরেই ভারতে ক্যাথলিক ধর্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে* (৫৫)।

১৮৯৮ সনের মার্চ মাসে উপাধ্যায় আবার লিখলেন যে,

* (৫৫) *Sophia*, July, 1897, p. 8

ভারতীয়দের মনোভাব সাধারণভাবে খৃষ্টধর্মের বিরোধী, আর তার কারণ এদেশবাসী খৃষ্টধর্মকে প্রথমত, বিজেতার ধর্ম এবং দ্বিতীয়ত, বিজাতীয় ধর্ম বলে জ্ঞান করে। তাই তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়দের সম্পর্কে বললেন তারা যেন তাদের আচরণে কখনো এই ধারণা অপরকে না দেয় যে ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ মানে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হয়ে যাওয়া* (৫৬)। ঐ বৎসরের মে মাসে 'সোফিয়া' পত্রে প্রকাশিত "A Catholic Monastery in India" নামক রচনায় তিনি অনুরূপ ভাব আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন ও বলেন যে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একটি মঠ স্থাপন করা দরকার। এই মঠটি সম্পূর্ণ হিন্দুধরণে পরিচালিত হবে। এতে একদল লোক ধ্যানধারণায় ও তপস্যায় মগ্ন থাকবে আর একদল পরিব্রাজকের জীবন যাপন করবে। তাদের চাল-চলনে ইউরোপীয় ছোঁয়াচটুকু পর্যন্ত থাকলে চলবে না। তাদের জীবনধারণের আদবকায়দা হবে হিন্দু সাধুদের মত। পরিব্রাজক ধর্মপ্রচারকদের একদিকে সেণ্ট্ টমাসের চিন্তাধারায় ও অন্যদিকে বেদান্ত দর্শনে পারদর্শী হতে হবে। আর্য মুনিঋষিদের ভারতবর্ষকে ক্যাথলিক ধর্মে টেনে আনতে "হিন্দু ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরাই" (Hindu Catholic Sannyasins) যোগ্যতম ব্যক্তি।

এর পর জুলাই, ১৮৯৮ সনে বের হয় উপাধ্যায়ের "Are We Hindus ?" নামক প্রবন্ধ। উপাধ্যায়ের ধর্মমতের স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে প্রবন্ধটি যারপরনাই মূল্যবান। ঐ প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, জন্মকালেও আমরা হিন্দু এবং মৃত্যু পর্যন্তও আমরা হিন্দু। কিন্তু দ্বিজ (দ্বিতীয়বার জাত) হিসাবে আমরা ক্যাথলিক। আচার-ব্যবহারে, আহার-বিহারে, ও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে আমরা

* (৫৬) *Sophia*, March, 1898, pp. 44-45

খাঁটি হিন্দু (genuine Hindus); কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাসে আমরা হিন্দুও নই, ইউরোপীয়ও নই, মার্কিনী নই বা চৈনিকও নই। আমাদের ধর্ম কোনো বিশেষ দেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, তা হলো বিশ্বজনীন। কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রণালী নিঃসন্দেহে হিন্দু। আমরা হিন্দুজাতির স্থায়িত্বে গর্ব অনুভব করি। আমরা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আস্থাবান। আমরা যত বেশি আমাদের সার্বজনীন ধর্ম (অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্ম) পালন করবো, তত বেশিই হিন্দু হিসাবে আমাদের উন্নতি ঘটবে। যত বেশি আমরা নরহরিকে অর্থাৎ যীশুখৃষ্টকে ভালবাসবো, তত বেশি আমাদের স্বদেশের প্রতি মমত্ব বাড়বে। কোন বিশেষ ধর্মমত অনুসরণের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। আমরা হিন্দু ক্যাথলিক * (৫৭)।

এর দুমাস পরে উপাধ্যায় "ক্যাথলিকধর্মীদের বেশভূষা" নামক এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, 'কা' এবং 'স্থল' এই দুই সংস্কৃত শব্দের অর্থ হলো কাল এবং স্থান। এই দুই শব্দের সমবায়ে যে বিশেষণ সৃষ্টি হয়—'কাস্থলিক'—তার অর্থ দাঁড়ায় সর্বকালের এবং সর্বদেশের। তাই কাস্থলিক ধর্ম হলো সর্বকালে ও সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত। ভারতের সন্তান-সন্ততিদিগকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের প্রচারকগণ এদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন,

* (৫৭) "By birth we are *Hindus* and shall remain *Hindu* till death. But as *dvija* (twice-born) by virtue of our sacramental rebirth, we are Catholic... In customs and manners, in observing caste and social distinctions, in eating and drinking, in our life and living, we are genuine Hindus, but in our faith we are neither Hindus nor European, nor American, nor Chinese, but all inclusive... In short, we are Hindus so far as our physical and mental constitution is concerned, but in regard to our immortal souls we are Catholic. We are Hindu Catholics." ১৮৯৮ সনের জুলাই সংখ্যার 'সোফিয়া' পত্র (পৃষ্ঠা ১০১-১০২) দ্রষ্টব্য।

প্রায় বিশ লক্ষ নরনারী ঐ ধর্ম গ্রহণও করেছিলো, কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে এদেশে বর্তমানে ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার যেন প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে (It cannot be denied that the progress of Catholicism in India has been checked almost to a dead stop)। এই নিশ্চল অবস্থার কারণ কি? উপাধ্যায় মনে করেন যে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদের বিদেশী বেশভূষাই ভারতীয়দের পক্ষে ঐ ধর্মের সার্বজনীন স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। ক্যাথলিক ধর্মের বহিরঙ্গে যে ইউরোপীয় আবরণ লক্ষণীয় তাকে হিন্দু প্রতিভা বরদাস্ত করতে পারে না। মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক পোষাক পরিয়ে ভারতে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের চেষ্টা বৃথা। বেদান্তের পরিভাষা ও চিন্তা-প্রণালীর মাধ্যমেই খৃষ্টধর্ম এদেশে প্রচার করতে হবে—অন্য ভাবে নয়। হতে পারে বেদান্ত দর্শন ষোল-আনা নির্ভুল নয়। কিন্তু প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলও কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুল করে রাখেন নি? ঐ গ্রীক দর্শন গ্রহণে যদি মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চ বীতশ্রদ্ধ না হয়ে থাকে, তবে একালে হিন্দুদর্শন গ্রহণেই বা তার আপত্তি থাকবে কেন? ক্যাথলিক দর্শন অতীব সুন্দর ও মহিমময়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর বিজাতীয় পরিচ্ছদ এদেশবাসীর পক্ষে ঐ দর্শন গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ক্যাথলিক ধর্মের ইউরোপীয় আবরণ যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই মঙ্গল। হিন্দুজাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে গেলে ক্যাথলিক ধর্মকেও হিন্দুয়ানীর বেশ পরিধান করতে হবে * (৫৮)। কিন্তু হিন্দুয়ানীর এই পরিধান খৃষ্টধর্মের শুধু

* (৫৮) আগষ্ট, ১৮৯৮ সনের 'সোফিয়া' পত্রে "The Clothes of Catholic Faith" প্রবন্ধে উপাধ্যায় লেখেন, "The Hindu mind is extremely subtle and penetrative, but is opposed to the Grœco-scholastic method of thinking. We must

বহিরঙ্গে থাকাই যথেষ্ট নয়, তার প্রাণের গভীরেও মাত্রা বিশেষে থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ দুইয়ের সংমিশ্রণে হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের সমবায়ে যে বস্তু উৎপন্ন হবে তা খৃষ্টান ধর্মের হিন্দু গড়ন ছাড়া আর কিছু নয়। ক্যাথলিক ধর্মকে হিন্দুত্বের দ্বারা রূপান্তরিত করবার পর যে ধর্ম দেখা দেবে তারই তিনি প্রচার চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে। অর্থাৎ মামুলি খৃষ্টধর্ম তিনি ভারতের জন্য আমদানী করতে চান নি। তাঁর এই পরিকল্পনা সমসাময়িক হিন্দু বা খৃষ্টান কেহই সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। ক্যাথলিক ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিগণও যেমন তাঁকে ভুল বুঝ্‌লেন, তেমনি হিন্দুরাও। উপাধ্যায়ের ধর্মজীবনের মূল কর্ম-প্রচেষ্টার দিকে উভয় সমাজের লোকেরাই বিস্ময়ে দৃক্‌পাত করলো মাত্র, তাঁর সাধনমার্গের সেই নতুন পন্থার সারমর্ম উপলব্ধির আন্তরিক চেষ্টা করলো না। তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার সঠিক মূল্যায়ন আজও নিরূপিত হয়নি।

নর্মদাতীরের "কাস্থলিক মঠ"

উপাধ্যায় ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মের যে হিন্দু গড়ন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ১৮৯৮ সনের শেষ দিক থেকে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই কল্পিত হিন্দু খৃষ্টানি বা খৃষ্টানি হিন্দুত্বের বাস্তব রূপ হলো জবলপুরে নর্মদা তীরে মঠ স্থাপন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি নির্জন নর্মদাতীর সাধনভূমিরূপে নির্বাচন করলেন। ১৮৯৯

fall back upon the Vedantic method in formulating the Catholic religion to our countrymen··· The European clothes of the Catholic religion should be removed as early as possible. It must put on the Hindu garment to be acceptable to the Hindus" (p. 124).

সনের জানুয়ারী মাসে 'সোফিয়া' পত্র মারফৎ এই নতুন মঠের পরিকল্পনা প্রচারিত হলো। উপাধ্যায় এর নাম দিলেন 'কাস্থলিক মঠ' * (৫৯)। তাঁর উদ্দেশ্য হলো এই মঠের শান্ত পরিবেশে এমন একদল সন্ন্যাসী গড়ে তোলা যাঁরা হবেন হিন্দু ক্যাথলিক বা ঈশাপন্থী হিন্দু, যাঁরা ধর্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবেন প্রস্তুত, যাঁরা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেবেন নতুন সমন্বয়ের অমৃত মন্ত্র। অল্প কিছুসংখ্যক ভক্ত-শিষ্য এসে আশ্রমে যোগদান করলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই একমত, কিন্তু তাঁদের সংগঠনে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মও স্বীকৃত হলো। উপাধ্যায়ের এই নব প্রচেষ্টায় হিন্দুয়ানীর যে গন্ধ পাওয়া গেল, তা ভারতীয় ক্যাথলিকেরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। উপাধ্যায়কে তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর মানসলোকের পরিবর্তন ঘটেছে—তিনি ক্যাথলিক বেশে হিন্দুত্বের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছেন। একদিন যাঁর খৃষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ এদেশীয় খৃষ্টান সমাজকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল, এখন সে-সমাজের লোকেরা উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। উপাধ্যায়কে তাঁদের ধর্মমতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে ক্যাথলিক সমাজের রক্ষণশীল মন অস্বীকার করলো। ১৮৯৯ সনের মার্চ মাসের পর 'সোফিয়া' পত্র আর প্রকাশিত হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই স্বপ্নের নর্মদাতীরের 'কাস্থলিক মঠ' দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলো। ক্যাথলিক সমাজের প্রতিকূলতা, বিশেষ করে ভারতীয় চার্চের তদানীন্তন সর্বোচ্চ প্রতিনিধি জালেস্কির (Zaleski) বিরোধিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

* (৫৯) *Sophia*, January, 1899, pp. 194-195

শঙ্করবেদান্তের অনুসরণ

উপাধ্যায়ের নর্মদাতীরের স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল বটে, কিন্তু হৃদয় থেকে খৃষ্টতত্ত্বও গেল না, বেদান্তও গেল না। অণিমানন্দ লিখেছেন যে, নর্মদাতীরেই উপাধ্যায়ের ভ্রাম্যমান মন এক দৃঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ভারতীয় ক্যাথলিক ধর্মের ভিত্তি হবে বেদান্ত * (৬০)। বেদান্তের সাহায্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়াসে প্রথম প্রথম তাঁর চিন্তার ভারসাম্য দেখা দিল খৃষ্টধর্মের সপক্ষে, কিন্তু গভীর অনুশীলনের ফলে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হলে তিনি বেদান্তকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর চিন্তার ভারসাম্য শঙ্কর-বেদান্তের সপক্ষেই ক্রমশ দেখা দেয়। ঐ মর্মে 'সোফিয়া' পত্রে তাঁর যে সকল রচনা বাহির হয়, তা পাঠ করে ক্যাথলিক সমাজের রক্ষণশীল প্রতিনিধিগণ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হন। ক্যাথলিক ধর্মাশ্রয়ীদের সঙ্গে সম্ভবত এইখানেই উপাধ্যায়ের বুদ্ধিদীপ্ত মনের বিরোধের সূত্রপাত। উপাধ্যায়ের জীবন নানারূপ ধর্মচিন্তা ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-কাহিনী। সত্য আবিষ্কারের নেশা তাঁর মনকে পাগল করে তোলে। জীবনের যে পর্বে তিনি যা সত্য বলে অন্তরলোকে অনুভব করেছেন, তা গ্রহণ করতে কখনো তাঁর কার্পণ্য বা শৈথিল্য ছিল না। দেশাচার, লোকাচারের কোনো ভয়, প্রতিবেশীর কোনো ব্যঙ্গ, প্রিয়জনের কোনো আঘাত তাঁকে কখনো তাঁর ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাই তিনি কখনও সদাচারী হিন্দু ব্রাহ্মণ, কখনও উৎসাহী ব্রাহ্মপন্থী, কখনও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান, কখনও হিন্দু ক্যাথলিক, পরিশেষে

* (৬০) *The Blade*, p. 82

ক্যাথলিক বৈদান্তিক। সত্য আবিষ্কারের পাগল-করা নেশা তাঁকে মত থেকে অন্য মতে, ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে নিয়ে যায়। অবশেষে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কার করলেন বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বে। খৃষ্টপ্রীতি থাকলো বটে কিন্তু এবার বেদান্তই প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। ভারতীয় সাধনা ও জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে উপাধ্যায়ের আত্মসমর্পণ তাঁর জীবনে ও জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

উপাধ্যায়ের ক্যাথলিক ধর্মপ্রীতি তাঁর পূর্বাশ্রমের শিক্ষা ও সংস্কারকে কখনও একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে নি। হিন্দুধর্মের যে বীজমন্ত্র প্রথম জীবনে তাঁর অন্তরে অঙ্কুরিত হয়, ক্যাথলিক ধর্মমত অনুসরণকালেও তা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নি। ফল্গুস্রোতের মত এই ধর্মের প্রভাব তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও ক্রিয়া করে চলে। এই নিঃশব্দ ধর্মস্রোত তাঁর শেষ জীবনে আবার বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবল হয়ে ওঠে।

> "সন্ধ্যার উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুধর্মের সনাতন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হিন্দু হইলেন। শেষে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তেজনায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আবার ভবানীচরণ হইলেন—ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেন" * (৬১)।

কালীঘাটে মায়ের নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে দেবীর নিকট এই বলে শেষ ইচ্ছা নিবেদন করেছিলেন,

> "মা, আমার এ দেহভার বহন করিতে আর সাধ নাই—বড়ই কলঙ্কিত অপবিত্র দেহ—আমায় আবার ব্রাহ্মণদেহ দিও, সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগৃহে আমাকে পাঠাইয়া দিও—আমি নবকলেবর ধারণ

* (৬১) 'বঙ্গবাসী', ২রা নবেম্বর, ১৯০৭—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

> করিয়া কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে আসিয়া তোমার কার্য—তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে সহায়তা করিব। আমি ত মা চিরকালই তোমার তুরন্ত ছেলে—আমি ত কাহারও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাই নাই—এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে যে, দেশের কাজ করিতে করিতে, সন্ধ্যার প্রচার করিতে করিতে—জেলে যাইবার পূর্বে যেন এ দেহ পঞ্চভূতে মিশায়" * (৬২)।

এ হলো স্বদেশভক্ত, প্রবল হিন্দুধর্মানুরাগী, কট্টর জাতীয়তাবাদী ব্রহ্মবান্ধবের বাণী। স্বদেশীযুগে এ বাণীর বাহন ছিল তৎপ্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) ও 'স্বরাজ' (১৯০৭) পত্রিকা। ঐ তুই পত্রিকা উগ্র জাতীয়তাবাদের মন্ত্র-প্রচারক, ভারতবাসীর স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ। 'সন্ধ্যা'-'স্বরাজের' ভেরী-নিনাদে পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়, শিক্ষাভিমানী, মোহাচ্ছন্ন বাঙালী জাতি একদিন চমকে ওঠে ও 'সন্ধ্যা'-'স্বরাজের' বাণীপ্রচারে অবলোকন করে ইংরেজ শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ভারতের জ্যোতির্ময় রূপ—উপলব্ধি করে হিমালয়ের পাদদেশে হিন্দুসমাজের অটল প্রতিষ্ঠা। যৌবনের মধ্যাহ্নে রোমান ক্যাথলিকতার একনিষ্ঠ পূজারীর শেষ জীবনে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন স্বভাব-ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই সাধিত হয়েছিল।

* (৬২) 'বঙ্গবাসী' ২রা নবেম্বর, ১৯০৭—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন

জবলপুর আশ্রমের পরিকল্পনা বিনষ্ট হবার পর উপাধ্যায় কিছুদিন উদাসীর মত বহু স্থানে পরিভ্রমণ করলেন। বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্যে বম্বে পর্যন্ত গমন করেও শারীরিক অসুস্থতায় বাধাপ্রাপ্ত হলেন। সে-যাত্রা আর তাঁর বিলাতযাত্রা হলো না। তিনি বম্বে থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৯০০)। এবার থেকে তাঁর জীবনের বাকি ক'বছর—বিলাত ভ্রমণের এক বৎসরকাল বাদ দিলে—বাংলা দেশের জলবায়ুর সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

'সোফিয়া' পত্রের নব পর্যায়

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর (১৯০০) উপাধ্যায় কিছুদিন ১নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন রেবাচাঁদ ও ক্ষেমচাঁদ। এই বাড়ী থেকেই ১৬ই জুন, ১৯০০ সনে উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সোফিয়া' (নব পর্যায়) প্রকাশিত হলো। 'সোফিয়া' পত্র এখন আর মাসিক থাকলো না—সাপ্তাহিক পত্রে হলো পরিণত। প্রতি শনিবার 'ফোলিও' সাইজের বারো পৃষ্ঠা সমন্বিত এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯০০ সন পর্যন্ত এই পত্রিকা চলেছিল। মোট ২৪টি সংখ্যা বের হয়।

মাসিক 'সোফিয়া'র মত সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্রও ছিল ক্যাথলিক চার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত। কিন্তু সাপ্তাহিক 'সোফিয়ার' সম্পাদনা প্রণালী পূর্বের থেকে হয়ে গেল অনেকখানি

স্বতন্ত্র। মাসিক 'সোফিয়া' ছিল প্রায় ষোলআনা ধর্মঘেঁষা পত্রিকা—বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করা ছিল এর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নব পর্যায়ে 'সোফিয়া' পত্রে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (comparative theology) নিয়মিত আলোচিত হতে আরম্ভ করে। প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়। পত্রিকার প্রথমভাগে 'টপিক্‌স্‌ অব দি ডে' নামে একটি অংশ থাকতো। এই অংশে সপ্তাহে সপ্তাহে দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় টিপ্পনী বের হতো। পত্রিকার আর একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল 'প্রশ্নোত্তর' (Questions and Answers)। এই অংশের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম-দর্শন-সমাজতত্ত্ব এবং খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বিবিধ জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর প্রদান করা * (৬৩)। অধিকন্তু পত্রিকার আর একটি অংশ ছিল—'নোট্‌স্‌' অর্থাৎ টীকা-টিপ্পনী। এই বিভাগেও ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হতো। তা'ছাড়া, গল্প ও প্রবন্ধও স্বতন্ত্রভাবে ছাপা-ছুপির ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাতে দেখি পত্রিকায় আরও একটি বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছে—'দি প্যানোরমা অব দি উইক্‌' নামক অংশ। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এই অংশটি হলো সাপ্তাহিক 'সোফিয়া'র প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ 'টপিকস্‌ অব দি ডে', তৃতীয় ভাগ প্রবন্ধ বিভাগ, চতুর্থ ভাগ 'নোটস্‌', পঞ্চম ভাগ 'প্রশ্নোত্তর'। পত্রিকার এই বিশেষত্বগুলি ১৯০০ সনের ৪ঠা আগষ্ট পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ১১ই আগষ্ট থেকে আবার দেখা যায় 'টপিক্‌স্‌ অব দি ডে' অংশটি পত্রিকার প্রথম ভাগে পরিণত হয়েছে এবং 'দি প্যানোরমা অব দি উইক্‌' অংশটি সর্বশেষ বিভাগে। ১১ই আগষ্টের

* (৬৩) *Sophia* (New series), June 16, 1900, p. 7

এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, ঐ সংখ্যা থেকে 'সোফিয়া' পত্রের ধর্মসংক্রান্ত অংশটি (পৃষ্ঠা ৫-৮) ছাত্রদের সুবিধার্থে আবার স্বতন্ত্রভাবে ছাপিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থাও অবলম্বিত হলো। পত্রিকার এই বিশেষত্ব শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথম দুইমাস পত্রিকার কার্যালয় ছিল ১নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কিন্তু ৪ঠা আগষ্ট থেকে পত্রিকার কার্যালয় ২০।১নং মদন মিত্র লেনে স্থানান্তরিত হয়। পত্রিকার ম্যানেজার বা কর্মকর্তা আগাগোড়াই ছিলেন উপাধ্যায়ের সিন্ধুদেশীয় শিষ্য ক্ষেমচাঁদ অমৃত রায়।

নবপর্যায়ে 'সোফিয়া' পত্র ধর্মালোচনায় যে নীতি গ্রহণ করে তা' ছিল পূর্বের থেকে অনেক বেশি উদার। পরধর্মসহিষ্ণুতার মাত্রা পূর্বের থেকে এখন অনেক বেশি লক্ষণীয়। এই পত্রিকা শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচারের বাহন ছিল না। এতে বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যাও খুব বড় স্থান দখল করে। উপাধ্যায় লিখলেন যে, হিন্দু প্রতিভার অপূর্ব সৃষ্টি বেদান্তকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছেন আর তাঁদের ভারতীয় অনুগামিগণও তাতেই সায় দিচ্ছেন। তাই 'সোফিয়া' পত্রে, বেদান্তদর্শনের যথাযথ ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ যত্নবান হলেন। সেই সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, এদেশে খৃষ্টধর্মকে সচরাচর বিকৃত করে প্রচার করা হয়। তাই তিনি ঐ ধর্মের সারমর্ম বিশ্লেষণেও দৃষ্টি দিলেন। তিনি লিখলেন 'সোফিয়া' পত্র কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে কাজ করবে না * (৬৪)। ক্যাথলিক চার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হ'লেও মাসিক 'সোফিয়া'র ন্যায় সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' উগ্র ক্যাথলিক-ঘেঁষা পত্রিকা ছিল না। এই সাপ্তাহিক পত্রে তিনি

* (৬৪) *Sophia*, Sept. 8, 1900. উক্ত সংখ্যায় "Our Personality" শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য।

যে সকল ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে তাঁর সংস্কারবর্জিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাথলিক ধর্মের গুণগান করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেদান্তদর্শনেরও তারিফ করতে লাগলেন। ক্যাথলিক ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বেকার গোঁড়ামি বর্জিত হলো, বেদান্ত সম্বন্ধেও নতুন ধ্যান-ধারণা করতে লাগলেন। খৃষ্টানুরাগী হলেও তিনি এই সময় ভারতীয় ও বৈদেশিক খৃষ্টান মিশনারীদের অনেক কাজকর্মই সমর্থন করতে পারলেন না। চীনের তৎকালীন দুর্দশার জন্য খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মনীতিকে দায়ী করে তীব্র আলোচনাও প্রকাশ করলেন * (৬৫)। উপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ক্যাথলিক সমাজের আবার বিরোধ দেখা দিল। জালেস্কি ক্যাথলিক সমাজে ঐ পত্রিকার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে ফতোয়া জারি করলেন (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০০)। ফলে সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্রও স্বল্পকাল পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় (৮ই ডিসেম্বর, ১৯০০)।

'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি'র প্রতিষ্ঠা

এর পরবর্তী ধাপ হলো উপাধ্যায় কর্তৃক 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' নামক মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন। এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ক্যাথলিক গণ্ডী বহির্ভূত ছিল। উপাধ্যায়ের পুরাতন ছাত্র কার্তিক চন্দ্র নান আর্থিক ঝুঁকি বহন করতে স্বীকৃত হলে ১৯০১ সনের জানুয়ারী থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হলো। কার্তিক চন্দ্র নান থাকলেন পত্রিকার প্রকাশক। জানুয়ারীর শেষ তারিখে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রতি ইংরেজি

* (৬৫) *Sophia*, July 21, 1900, pp. 2-4

মাসের শেষ তারিখে এই পত্রিকা বের হতো। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪।

'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত * (৬৬) যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে জড়িত থাকলেও উপাধ্যায়ই ছিলেন পত্রিকার প্রাণস্বরূপ। পত্রিকার নামকরণও উপাধ্যায়েরই। সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্র ক্যাথলিক সমাজের বিরোধিতায় বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলে উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে ১৭ই নবেম্বর, ১৯০০ সনে তাঁর পরিকল্পিত 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকার বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করেন * (৬৭)। তিনি বলেন যে, ঊনবিংশ শতকের অবসানে ও বিংশ শতকের সমাগমে ভারতীয় ক্যাথলিক চার্চকেও নতুন নীতি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমানে ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভারতবাসীর চিন্তা ও জীবনধারাকে তেমন কিছুই প্রভাবিত করতে পারছেন না। তাঁরা এদেশে অনেকটা পরগাছার মত—দেশের মাটিতে তাঁদের শিকড় নেই বললেই চলে। তাই ক্যাথলিকদের জাতীয় ভাবে শিক্ষিত-দীক্ষিত করে তোলার জন্য এদেশে গড়তে হবে এক কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থা। ক্যাথলিকদের শিক্ষানীতি এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে স্বদেশপ্রেমিক, চিন্তানায়ক ও সমাজনায়ক আবির্ভূত হন। আজ সময় এসেছে যখন খৃষ্টধর্মের সার্বজনীন স্বরূপ এদেশবাসীর সামনে যুক্তিনিষ্ঠভাবে প্রদর্শন করতে হবে, তাদের দেখাতে হবে ধর্মবিশ্বাসে আমরা

* (৬৬) *Vide* Nagendra Nath Gupta's *Reflections and Reminiscences* (Bombay, 1947, p. 208).

* (৬৭) *Sophia*, Nov. 17, 1900—"The Church : Twentieth Century" প্রবন্ধ (p. 9) দ্রষ্টব্য।

দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ, আমরা ভারতীয়ও নই, ইউরোপীয়ও নই ; কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে আমরা খাঁটি হিন্দু। এই নবাদর্শ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চার করতে পারলেই এদেশবাসীর সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। এজন্য চাই এক নতুন পত্রিকা। সেই পত্রিকার নাম হবে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী'।

'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রের প্রকাশ উপাধ্যায়ের এক স্মরণীয় কীর্তি। সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্রের ন্যায় এই পত্রিকাও পুরাপুরি ধর্মঘেঁষা ছিল না। ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে সাহিত্য, সমাজনীতি ও অর্থনীতির কথাও মাত্রা বিশেষে এই পত্রে আলোচিত হতো। তা'ছাড়া, ধর্মব্যাখ্যাও মামুলি ধরণের ছিলনা। আলোচনা-প্রণালী ছিল তথ্যপূর্ণ ও তুলনামূলক। খৃষ্টদর্শনের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা চলতো পাশাপাশি। এই দুই ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে উপাধ্যায়ের মন ক্রমশই বেদান্তানুরাগী হতে থাকে। নবপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশিত তাঁর "Sankara's Introduction to the Vedanta" (জানুয়ারী, ১৯০১), "M. Thibaut's Introduction to the Vedanta—A Critique (ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, ১৯০১), "Vedic Theism" (মে, ১৯০১), "Vedantism and Vaishnavism" (আগষ্ট, ১৯০১), "The Sankhya Philosophy" (ডিসেম্বর, ১৯০১) প্রবন্ধগুলি যারপরনাই মূল্যবান। ঐ প্রবন্ধগুলিতে তিনি মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের পরিবর্তে প্রকৃত সত্যান্বেষণী সাধকের দৃষ্টি নিয়ে হিন্দুধর্মের সারমর্ম যথাযথভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। কখনও 'উপাধ্যায়' নামে, কখনও 'নরহরি

দাস' এই নামে তাঁর ঐ সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। খৃষ্টনীতি সম্বন্ধেও তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনা বের হয়—যেমন "The Incarnate Logos" (জানুয়ারী, ১৯০১) "A Brief Outline of Christianity" (ফেব্রুয়ারী, ১৯০১), "Christianity in India" (মার্চ, ১৯০১), "Christ's Claims to Attention" (এপ্রিল, ১৯০১) ইত্যাদি প্রবন্ধ। "Christianity in India" প্রবন্ধে উপাধ্যায় তাঁর পুরানো মতের পুনরাবৃত্তি করে লিখলেন যে, খৃষ্টধর্মের ভারতীয়করণ সম্পন্ন না হলে এদেশে খৃষ্টধর্মের প্রসারের আর কোনো আশা নেই। ঐ প্রবন্ধে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, এদেশীয় খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ আজও ভারতীয়দের রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন। আজ সারা ভারতে নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীরা এর প্রাণস্পন্দন থেকে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। মিশনারীরা যেভাবে খৃষ্টধর্মকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করছে, তা' অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এর থেকেই বুঝা যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এই সময় উপাধ্যায়ের মনে কিভাবে ক্রিয়া করে চলেছিল। উপাধ্যায় 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রে শুধু ভারতের ধর্ম-দর্শনই আলোচনা করলেন না, সেই সঙ্গে সমান উৎসাহে তার সমাজতত্ত্ব, শিক্ষানীতি ও রাজনীতিও আলোচনা করতে থাকেন। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলীও এতে প্রকাশিত হতো। ১৯০১ সনের জুলাই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত "নৈবেদ্য" কবিতাগ্রন্থের বড় সমালোচনা বের হয়। সেই সমালোচনা পড়ে কবি এত খুশী হন যে, বহুদিন পরেও তিনি লিখেছিলেন সে সময় তাঁর কবিতার

এমন উদার অকৃপণ প্রশংসা তিনি আর কোথাও পান নি * (৬৮)। এই পত্রিকায় উপাধ্যায়ের সহযোগী নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ইতিহাসের উপর অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাঝে মাঝে মোহিতচন্দ্র সেন এবং রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধও বের হতো। ফলে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে এই পত্রিকা উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করে। এই পত্রিকার ধর্মবিষয়ক উদার আলোচনা-প্রণালীও ক্যাথলিক সমাজের মনঃপূত হলো না। জালেস্কি তখন রোমে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে তাঁর কাছে নালিশ গেল। তিনি রোম থেকেই 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী'র বিরুদ্ধে এক ফতোয়ার মাধ্যমে ভারতীয় ক্যাথলিকদের উদ্দেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। এই পত্রিকা ক্যাথলিক চার্চের পত্রিকা ছিল না; তা ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিণতি। এর আর্থিক দায় বহন করতেন কার্তিক চন্দ্র নান। জালেস্কির আচরণে উপাধ্যায় প্রথমে এতই ক্রুদ্ধ হলেন যে জালেস্কির বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করেন। সেই মর্মে এটর্ণীর পরামর্শও গ্রহণ করা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর বিষয়টিকে আদালত অবধি গড়াতে দিলেন না।

আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র-প্রচার

বিংশ শতকের সূচনায় আমরা যে উপাধ্যায়কে অবলোকন করি, সে উপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণময় প্রতিনিধি। বাহিরে তিনি এখনও রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে তিনি জাতীয়তাবাদী। বিদেশী ও বিজাতীয়

* (৬৮) 'প্রবাসী' (আশ্বিন, ১৩৪০) পত্রে রবীন্দ্রনাথের "আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার বিষময় ফল সম্বন্ধে এখন তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। জাতীয় জীবনে নবজাগরণের জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন জাতির জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন। উপাধ্যায়ের জীবনী-লেখক প্রবোধচন্দ্র সিংহ লিখেছেন,

> "বেদান্ত-দর্শনের সাহায্যে তিনি হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের মূলতত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সেই অনুসন্ধানের ফলে তিনি হৃদয়ে অনুভব করলেন যে, হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্মের অর্থাৎ হিন্দুসমাজতত্ত্বের মূলও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নানা বর্ণভেদ এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থাদি নানা আশ্রমভেদ থাকিলেও এ সকল ভেদ ব্যবহারিক ভেদমাত্র; পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোনও প্রভেদ নাই। যেহেতু সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমই সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে অধিষ্ঠিত। তিনিই সকলের মূলাধার এবং তিনিই সকলের পরমগতি" * (৬৯)।

এইভাবে হিন্দু দর্শন ও হিন্দু সমাজতত্ত্বের অন্তঃস্থলে উপাধ্যায় যতই প্রবেশ করতে লাগলেন, ততই হিন্দু ধর্ম ও সমাজতত্ত্বের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও মমত্ব বৃদ্ধি পেলো। তিনি হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হলেন। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস হলো হিন্দুজাতির ভবিষ্য পুনরুত্থান হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও হিন্দু সমাজতত্ত্বের সুষ্ঠু সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই সংঘটিত হবে—বিদেশীয় ও বিজাতীয় সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর অনুসরণের দ্বারা নয়। 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা" প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখলেন,

> "হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহপরকালে

* (৬৯) "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব", পৃষ্ঠা ৪০-৪১

মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠিত হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও" * (৭০)।

আত্মপ্রতিষ্ঠা না হলে যেমন ব্যক্তিগত তেমন জাতীয় মনীষা কখনও সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয় না। বিংশ শতকের প্রারম্ভ কালে ভারতবর্ষকে খৃষ্টানধর্মের সপক্ষে আকর্ষণ করার নেশার থেকেও যে-নেশা উপাধ্যায়কে বেশি করে পেয়ে বসে, তা হলো হিন্দুসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি হবে ভারতীয় শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতি। সেই মূল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভারত-বাসীকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে— নিজের জাতীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে নয়, তাকে আরও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবার উদ্দেশ্যেই। স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে উপাধ্যায় যে জাতীয়দাবাদের মন্ত্র প্রচার করতে বাঙালীর জীবনমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন তারও মূল কথা এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ।

জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ঘোষণা

জাতির মানসলোকের পরিবর্তনের জন্য সকলের আগে প্রয়োজন শিক্ষা। জাতীয় স্বার্থের অনুকূল, জাতীয় মনীষার পরিপোষক শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়েম করতে না পারলে জাতীয় সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। ইংরেজ-প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃতি বিজাতীয়, এর বিষয়বস্তুও বিজাতীয়, জাতীয় স্বার্থের ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সংযোগ নেই বললেই চলে। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এই সময় এদেশের বহু মনীষীকে ভাবিয়ে তোলে। সেই সব ভাবুকদের মধ্যে বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর

* (৭০) 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), বৈশাখ, ১৩০৮। ঐ পত্রিকায় উপাধ্যায়ের আরও কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিহাসে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০১ সনের আগষ্ট মাসে সিমলাতে লর্ড কার্জনের পৌরোহিত্যে যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের দ্বারা এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আশু সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন * (৭১)। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য পরিণতির কথা লিখতে গিয়ে উপাধ্যায় মন্তব্য করলেন যে, শিক্ষার মান উন্নতির নামে লর্ড কার্জন যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা উত্থাপন করেছেন তার আসল উদ্দেশ্য ভারতবাসীর জাতীয় সত্তার পূর্ণতর বিকাশ নয়—উদ্দেশ্য হলো বিজাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করে এদেশ-বাসীর জাতীয় ভাবের বিনাশ সাধন। তিনি আরও বলেন যে, লর্ড কার্জন বাহিরে উদারতা প্রদর্শন করলেও তিনি প্রাণে প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী। ভারতে অ্যংলো-স্যাক্সন্ জাতির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার উপায় হিসাবেই এই প্রস্তাবিত শিক্ষা বিল উত্থাপিত হয়েছে। ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় ও জীবনাদর্শে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করুক—তা' হলো ইংরেজ স্বার্থ-বিরোধী। আমাদের সমাজ যত বেশি তার মূল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ও যত বেশি পাশ্চাত্য শিক্ষার সুরা পান করে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, ততই ভারতে ইংরেজ স্বার্থ হবে নিরাপদ। লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব কার্যকরী হলে তা' আমাদের জাতীয় সত্তা বিকাশের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে। আজ দিন এসেছে যখন ভারতবাসীর শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমাদের গড়তে হবে নতুন নতুন

* (৭১) *The Twentieth Century*, August, 1901, pp. 190-194.

বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে হিন্দুচিন্তা ও আদর্শের ঠাঁই হবে সব থেকে উঁচুতে ও যেখানে ইউরোপীয় আদর্শকে গৌণ আসন দেওয়া হবে। সকলের আগে শিক্ষাজগতে আমাদের এই বিপ্লব সাধন করা প্রয়োজন * (৭২)।

সিমলা ষ্ট্রীটের বিদ্যায়তন

মানসিক বিবর্তনের এই পটভূমিতে উপাধ্যায় জাতীয় আদর্শের অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় ১৯০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার সিমলা ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্রায়তন আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে এই বিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। কার্তিক চন্দ্র নানের পুত্র সুধীর চন্দ্র নান, তাঁর পিসতুতো ভাই রাজেন ও অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্রের ভাইপো যোগানন্দ মিত্র এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। উপাধ্যায়ের সিন্ধী শিষ্য রেবাচাঁদ আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল বৈদিক আদর্শে হিন্দু বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান ও ব্যক্তিগত সান্নিধ্য দ্বারা তাঁদের চরিত্র গঠন। এই বিদ্যালয়ের কার্য সুরু হবার স্বল্পকাল পরেই (ডিসেম্বর, ১৯০১) উপাধ্যায় রেবাচাঁদকে ও ছাত্রদিগকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরে

* (৭২) "...the time is now come to throw off the English yoke in matters of education...We must erect universities of our own where the European ideal must be made subservient to Hindu thought and thinking. ...The order must be reversed and a revolution effected. European thought, European ideal is no more to be allowed to play the dominant part in the education of our youths. The main line of culture should be primarily national Foreign culture should be auxiliary, helping and steadying Hindu susceptibilities to attain to perfection."—Vide *The Twentieth Century*, Sept, 1901, p. 218

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হলেন * (৭৩)।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈদিক আদর্শে শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপনে উদ্যোগী হলে উপাধ্যায় তাঁর পাশে দণ্ডায়মান হন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে উভয়ের সমবেত চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। বিদ্যালয়ের ছাত্র, অজিতকুমার চক্রবর্তী পরবর্তীকালে লিখেছিলেন :

> "বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয়ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়া আনিলেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। অধিক বয়সের ছাত্র লওয়া হইবে না, এই নিয়ম গোড়া হইতেই প্রবর্তিত হইল। ছাত্ররা নগ্নপদ হইল, উপানৎ এবং ছত্র-ধারণ দুই-ই তাহারা বর্জন করিল। প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় বসিতে হইত, তাহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। রন্ধন ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে হইত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁধে তাহারা স্নানার্থ গমন করিত, তারপর শুচিস্নাত হইয়া উপাসনান্তে এখনকার ল্যাবরেটরি গৃহে বা মুক্তপ্রাঙ্গণে বেদগান করিত। সকল ছাত্র ও অধ্যাপক সেই সময়ে মিলিত হইতেন। উপাসনান্তে ছাত্ররা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতলে গিয়া উপবেশন করিত। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইত। 'ইংরেজি সোপান' এবং 'সংস্কৃত প্রবেশ'-এর সেই সময়েই সূত্রপাত। কবি নিজে মুখে মুখে কথাবার্তা কহিয়া ইংরেজি শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বাক্য রচনা করিতে বালকেরা শিক্ষা করিত। এইরূপে ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যাকরণ স্বতন্ত্র

* (৭৩) এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

> করিয়া না পড়িয়া মাতৃভাষা শিক্ষার ন্যায় ইংরেজি ও সংস্কৃত দুই-ই তাহারা শিখিত"* (৭৪)।

'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে'-এর প্রাথমিক সংগঠনে ও পরিচালনায় উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে যে সাহায্য প্রদান করেন, সে কথা কবি নিজেই এই বলে উল্লেখ করেছেন,

> "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন—তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুর-মাত্রও কোনও দিন দেখি নাই—তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল"* (৭৫)।

বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদের সম্পর্ক অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল। বোলপুর বিদ্যালয় পরিচালনা কালেও উপাধ্যায়কে ঘন ঘন কলিকাতায় কার্যোপলক্ষে আসতে হতো। ১৯০২ সনের আগষ্ট মাসে বোলপুর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তিনি ও রেবাচাঁদ চলে আসেন এবং ঐ সময়ই সিমলা ষ্ট্রীটে "সারস্বত আয়তন" নামে আর একটি ক্ষুদ্রাকার বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন (আগষ্ট, ১৯০২)। এর প্রথম ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র আটজন। রেবাচাঁদ শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। দু'মাস পরে ঐ বিদ্যালয় ৯নং ছিদাম মুদি লেনে স্থানান্তরিত হয়।

বিলাত-যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব

উপাধ্যায়ের মন তখন বিলাত যাত্রার আগ্রহে উদ্বেলিত। বিলাতে বেদান্ত প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্নে তখন তিনি বিভোর। তাঁর

* (৭৪) অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত "ব্রহ্ম বিদ্যালয়", পৃষ্ঠা ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য।
* (৭৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "আত্ম-পরিচয়," পৃষ্ঠা ১২৬, দ্রষ্টব্য।

বিলাতযাত্রা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখ প্রয়োজন। বিবেকানন্দ উপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু—যৌবনে একজন ছিলেন রামকৃষ্ণপন্থী, আর একজন কেশবপন্থী ; তারপর দুজনে দুজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারে উন্মুখ, আর উপাধ্যায় ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাকুল। মাসিক 'সোফিয়া' পত্র পরিচালনা কালে তিনি বিবেকানন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক বিবেচনা করে রামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বিদ্রূপ বাণও বর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভুল বুঝা নিতান্ত ক্ষণিক, যদিও ক্ষণটুকু মিথ্যা নয়। কিন্তু উপাধ্যায় যতই গভীরভাবে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অনুশীলনে নিমগ্ন হলেন, ততই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দু সাধনায় বেদান্তের অটল প্রতিষ্ঠা, হৃদয়ঙ্গম করলেন এর মহান মন্ত্রের সার্থকতা। বেদান্ত-সমালোচক উপাধ্যায় ক্রমে ক্রমে বেদান্ত-প্রেমিকে পরিণত হলেন। এই রূপান্তরের মূলে বিবেকানন্দী প্রভাব ছিল প্রকাণ্ড। উপাধ্যায় বিলাত থেকে ঘুরে আসার বছর তিনেক পরে লিখলেন,

> "দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব···বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ

কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগর পারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম" * (৭৬)।

বিবেকানন্দের আদর্শ এই সময় তাঁকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর আরব্ধ কর্মের সহায়তা করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ভারতবাসীর মুক্তির উপায় সন্ধান করতে স্বামীজী বিলাত গমন করেছিলেন * (৭৭)—একথা উপাধ্যায়ের অজানা ছিল না। ভারতের অন্তবিহীন দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য স্বামীজীর অন্তরাত্মা কত গভীরভাবে আকুল ছিল তাও তিনি জানতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন,

"আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন। এস—একবার কলিকাতা সহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব—তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা—কাহার জন্য ব্যথা। দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা * (৭৮)।

* (৭৬) 'স্বরাজ' পত্রে "বিবেকানন্দ কে?" প্রবন্ধ (২২শে বৈশাখ, ১৩১৪, পৃষ্ঠা ৯৯) দ্রষ্টব্য।

* (৭৭) B. N. Datta's *Swami Vivekananda* (কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ১৯৭)

* (৭৮) 'স্বরাজ' পত্রে "বিবেকানন্দ কে"? প্রবন্ধ (২২ শে বৈশাখ, ১৩১৪, পৃঃ ৯৯) দ্রষ্টব্য।

স্বামীজীর মর্মবাণী উপাধ্যায়ের অন্তরে ধ্বনিত হলো। মাত্র সাতাশ টাকা অবলম্বন করে তিনি বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কলিকাতা থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে বম্বে এলেন। মাদ্রাজে পাথেয় সংগৃহীত হলো। ৫ই অক্টোবর, ১৯০২ সনে ইতালীয় কোম্পানীর জাহাজে চড়ে তিনি বম্বে থেকে রওনা হলেন। ইতালী থেকে ফ্রান্স হয়ে ৫ই নবেম্বর একেবারে বিলাতের বিদ্যাকেন্দ্র অক্সফোর্ডে এসে উপস্থিত। জাহাজে থাকা-কালীন বুয়োর সেনাপতির সহিত পরিচয় ও তাঁর মুখে বুয়োর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রবণ উপাধ্যায়ের জীবনে স্মরণীয়। বুয়োর যুদ্ধের কাহিনী তৎকালে ভারতের জাতীয়তাবাদকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। এদেশের সংবাদপত্র সমূহে ঐ যুদ্ধের ঘটনাবলী সে সময় সাড়ম্বরে প্রচারিত হতো।

বিলাত-প্রবাসী ব্রহ্মবান্ধব

বিলাত থেকে উপাধ্যায় নিজ অভিজ্ঞতা বিবৃত করে ১৩ই নবেম্বর, ১৯০২ সন হতে ১২ই জুন, ১৯০৩ সনের মধ্যে অনেকগুলি পত্র-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি তৎকালে 'বঙ্গবাসী' পত্রে মুদ্রিত হয় ও পরে আরও একখানি চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর জীবদ্দশাতেই "বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল (আগষ্ট, ১৯০৬)। এই চিঠিগুলি উপাধ্যায়ের জীবনেতিহাসের ও বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। এই চিঠিগুলির ভাষা যেমন আন্তরিকতাময়, ভাবও তেমনি মর্মস্পর্শী। উপাধ্যায়ের চরিত্রে গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাল্কা হাস্যরসের যে অপূর্ব মিলন ঘটেছিল, এই চিঠিগুলির মধ্যেও সেই বিশেষত্ব উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। তাঁর বিলাত থেকে লেখা প্রথম চিঠির প্রথম

লাইনগুলিও রীতিমত উপভোগ্য। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখলেন,

> "আমি একজন ইংরেজি-পড়া সন্ন্যাসী। আজ কাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের বুকনি-মিশানো বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও এক দিন সখ হোলো যে বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতায়, মুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সন্ন্যাসীর মন—যেমনি খেয়াল অমনি উঠা।"

উপাধ্যায় বিলাত-প্রবাসী ছিলেন মাত্র আট মাস (নবেম্বর, ১৯০২ থেকে জুন, ১৯০৩)। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে দেশের বিদ্বৎসমাজে যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তা বিস্ময়কর। প্রথমে উপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "হিন্দু চিন্তা" (Hindu Thought) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক এ. এ. ম্যাক্‌ডোনেল্ (A. A. MacDonnell) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব ইতিপূর্বেই 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকা মারফৎ উপাধ্যায়ের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এরপর উপাধ্যায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও তিনটি ভাষণ প্রদান করেন (ডিসেম্বর, ১৯০২)। বক্তৃতার বিষয়বস্তু যথাক্রমে ছিল "হিন্দুর আস্তিক্যবাদ" (Hindu Theism), "হিন্দুর নৈতিকতা" (Hindu Ethics) ও "হিন্দুর সমাজতত্ত্ব" (Hindu Sociology)। বেলিয়ল কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর কেয়ার্ড (Dr. Caird) শেষোক্ত তিনটি বক্তৃতা-সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ সনে লেখা উপাধ্যায়ের এক পত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর অক্সফোর্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী বিলাতবাসীর মনে যথেষ্ট সাড়া সৃষ্টি করেছিল। বিলাতের সুবিখ্যাত দর্শন পত্রিকা

'মাইণ্ড'-এর (*Mind*) সম্পাদক ডক্টর স্টাউট্-এর (Dr. Stout) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলে তিনি ঐ পত্রে "Freedom of Being" নামক একটি দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদকের হাতে দিয়ে আসেন। উপাধ্যায়ের চিঠি থেকে জানা যায় যে, ডক্টর স্টাউট্ ঐ প্রবন্ধটির বিশেষ তারিফ্ করেছিলেন ও ঐ বৎসরের এপ্রিল বা জুলাই সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশের আশ্বাসও প্রদান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে জানুয়ারী, ১৯০৩ সনে বিলাতের 'ট্যাব্লেট্' (*The Tablet*) নামক পত্রিকায় উপাধ্যায়ের 'ভারতে খৃষ্টান ধর্ম' বিষয়ে লেখা দুটি প্রবন্ধ যে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ প্রবন্ধদ্বয়ে উপাধ্যায় বর্তমান ভারতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের সুপ্রচলিত নীতির ব্যর্থতার কথাই শুধু উচ্চারণ করলেন না, তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, ভারতে খৃষ্টান ধর্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর মাধ্যমে ঐ ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার উপর। তিনি বলেন,

> "What strikes every observer of the missionary field of work in India, is its frightful barrenness. It is unquestionable, and perhaps unquestioned too, that Christianity is not at all thriving in India. There it stands in the corner, like an exotic stunted plant with poor foliage, showing little or no promise of blossom. Conversions, are almost nil so far as the Hindu community is concerned"* (৭৯).

ভারতে ক্যাথলিক চার্চের শোচনীয় স্থিতিশীলতার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উপাধ্যায় লিখলেন যে, হিন্দু জাতির চিন্তাপ্রণালী স্বাতন্ত্র্যময়। সেই স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন করে কোনো বিজাতীয় ধর্ম-প্রচার

(৭৯) *The Blade*, Appendix I, pp. i-iv

বর্তমান ভারতে সম্ভব নয়। হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর মাধ্যমে যদি খৃষ্টতত্ত্ব প্রচার করা হয়, তা'হলেই কেবল ভারতবর্ষে ক্যাথলিক চার্চের একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়, অন্যথা নয়।

> "To my mind the best and the most congenial way of teaching Theism to the educated as well as to the non-educated in English will be through Hindu thought...By Hindu thought I do not mean the various doctrines, tenets, or theories prevailing among different philosophical schools or sects in India. It is a trend of thinking which has given a peculiar direction to all Hindu speculations."

অক্সফোর্ডে বক্তৃতাবলী প্রদানের পর উপাধ্যায় কিছুদিন লণ্ডন সহরে অবস্থান করেন ও সেখানেও কয়েকটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। উত্তর লণ্ডনের থিওসফিক্যাল্ সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন যে, বিলাতের লোকেরা আজও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মোটের উপর অজ্ঞ। সেদেশের ধর্মপ্রচারকগণ ও রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষে এসে শুধু গুরুগিরি করতে আগ্রহান্বিত থাকেন, কিন্তু কখনও ভারতীয়দের জীবনদর্শন উপলব্ধির আন্তরিক চেষ্টা করেন না। তাই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি আরও বলেন, ইংরাজেরা যখন ভারতীয়দের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠবে, তখনই উভয় জাতির মধ্যে সত্যকার বন্ধুত্ব ও মিলন সাধিত হতে পারে। একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধার দ্বারাই উভয়ের এই মিলন সাধন সম্ভব* (৮০)।

বিলাতপ্রবাসী উপাধ্যায়ের জীবনে এর পরবর্তী স্মরণীয় ঘটনা

* (৮০) *Ibid*, pp. 114—115

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান। ১৯০৩ সনের মার্চ মাসে উপাধ্যায়ের কেম্ব্রিজ বক্তৃতা-সফর সুরু হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রিনিটি কলেজে' তিনি সর্বসমেত তিনটি ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু যথাক্রমে ছিল 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম', 'হিন্দুর ধর্মনীতি' ও 'হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব'। সুবিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর ম্যাক্‌টাগার্ট (Dr. McTaggart) প্রত্যেক দিনই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজে উপাধ্যায়ের বক্তৃতাবলী এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করতেও আগ্রহান্বিত হন। তদুদ্দেশ্যে একটি ছোট কমিটিও গঠিত হলো। তাতে ছিলেন অধ্যাপক র‍্যাশ্‌ডল্ (Prof. Rashdall), ডক্টর ম্যাক্‌টাগার্ট, ডক্টর রুজ্ (Dr. Rouse), অধ্যাপক স্টাউট (Prof. Stout), অধ্যাপক সোর্‌লে (Prof. Sorley) প্রমুখ বিশিষ্ট সাতজন। ঐ কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। হিন্দুদর্শনে পারদর্শী জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত নির্বাচন করে কেম্ব্রিজে পাঠাবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো উপাধ্যায়ের উপর। এই ভারতীয় অধ্যাপককে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরব্যাপী হিন্দু দর্শনের পাঠক্রম অধ্যাপনা করতে হবে। শুধু যোগ্য অধ্যাপক নির্বাচনই নয়, প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের দায়িত্বও উপাধ্যায়ের উপর এসে পড়লো। ভারতের পক্ষ থেকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে নয় হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্বও তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন* (৮১)।

বিলাতে থাকাকালীন উপাধ্যায় অক্সফোর্ড মহিলা সভায় হিন্দুর

* (৮১) *The Blade*, p. 117

গৃহস্থালী সম্বন্ধেও বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা সাদরে গৃহীত হয়। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন জগদ্বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম স্টেডের (W. Stead) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বিলাত থেকে চলে আসার অব্যবহিত পরেই (১৫ই জুলাই, ১৯০৩) স্টেড্ সাহেব তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, উপাধ্যায়ের জীবন হলো বিরাট বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিজয় লাভের দৃষ্টান্ত ("instance of success achieved against great odds by the might of individual initiative")। বিলাতে থাকা-কালীনই উপাধ্যায়ের লেখা "বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি" ধারাবাহিকভাবে কলিকাতার 'বঙ্গবাসী' পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। এই চিঠিগুলি পড়ে বাংলার সুধী সমাজ তাঁর হৃদয়বত্তা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয় পেলো। বিলাতী সভ্যতার অফুরন্ত ভোগলিপ্সা, সমাজজীবনে অহর্নিশ প্রতিযোগিতা ও স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, গৃহ-জীবনে দিবারাত্র অস্থির অশান্তি ও উদ্দাম স্ত্রী-স্বাধীনতা তাঁর মনকে ব্যথিত ও পীড়িত করে তোলে। পশ্চিমী সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি অবলোকন করলেন নিবৃত্তি মূলক হিন্দু সভ্যতার গরিমা ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধুর্য। ১৯০৩ সনের জানুয়ারী মাসে লিখিত এক পত্রে তিনি বাঙালী জাতির উদ্দেশে ব্যক্ত করলেন,

> "উদ্দাম-প্রবৃত্তি যুবকদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে ভারতে না জন্মানই ভাল ছিল। তাই দেখা যায় যে যত যুবক এখানে আসে—অধিকাংশই সাহেব হোয়ে সাহেবি বিলাসিতায় ডুবে মরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখিলে মোহ ঘুচে যায়। এখানকার গৃহস্থদের জীবনে শান্তি নাই।...এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচং এ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি

আমাদেরই ইষ্টদেবতা...জিগীষার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্ রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হইয়া কুল-ধর্ম পালনে রত হউক"* (৮২)।

বিলাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার উদ্দাম গতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে উপাধ্যায় আবার লিখলেন,

"সাংখ্যদর্শনে বলে যে প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন খুলে আপনার স্বরূপ জানায় তখন পুরুষের মুক্তি হয়। এখানে প্রকৃতি অবগুণ্ঠিত নহে। মাঠে ঘাটে হাটে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখে। এখানকার পুরুষেরা তবে সাংখ্যমতে মুক্ত। সাংখ্যমতে হউক আর না হউক আমাদের বিলাত-প্রবাসী দেশী ভায়াদের মতে সাহেবেরা মুক্ত পুরুষ। কেননা প্রকৃতিকে তারা অবাধে দেখে। এইরূপ মুক্তি দেশে আমদানী করিবার জন্য এরা ব্যস্ত। বাস্তবিক এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড।...সত্যি কথা বলিতে কি—বিলিতি সভ্যতার আড়ম্বর আমার একেবারে ভাল লাগে না। প্রকৃতিকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি আমার দু'চক্ষের বিষ। হোতে পারে আমার স্বভাব একঘেয়ে হোয়ে গেছে, তাই বুঝি মধুও পান্‌সে পান্‌সে লাগে।... আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি-জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না। হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন।...প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ যিনি ভূমা অনন্ত সর্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল

* (৮২) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি" (কলিকাতা, ১৯০৬, পৃষ্ঠা ২২-২৫) দ্রষ্টব্য।

ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাহার নিকট কেবল বাহুল্যমাত্র।...হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্বলাভ হিন্দুর আদর্শ। আজ হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।"

অনাত্মের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে যেমন স্বকীয় ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, তেমন বিদেশী সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় হৃদয়ঙ্গম করলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার স্বাতন্ত্র্য-মাহাত্ম্য। পরানুকরণের মোহ থেকে স্বদেশবাসীর মনকে মুক্ত করে তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করলেন নিজের ঘরে জাতিকে সর্বপ্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তুলতে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন জাতীয় মুক্তি অসম্ভব জ্ঞান করেছিলেন বলেই তিনি বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর স্বজাতির গৌরব কীর্তনে এমন পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বিলাতপ্রবাস তাঁর জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে আরও প্রদীপ্ত করে তোলে। তাই বিলাত থেকে ফিরে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেবাই তাঁর হয়ে দাঁড়ালো জীবনের পরম ধ্যান ও পরম তপস্যা।

১৯০৩ সনের জুলাই মাসে উপাধ্যায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। অশেষ চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় একরূপ সংগ্রহ করলেন, এমন কি নানা আলাপ-আলোচনার পর আচার্য ব্রজেন্দ্র-নাথ শীলের নামও সুপারিশ করে কেম্ব্রিজ কমিটিকে পত্র লিখলেন। কিন্তু এই সময় নানারূপ অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতা এসে উপস্থিত হওয়ায় উপাধ্যায়ের পরিকল্পনা আর শেষ পর্যন্ত বাস্তবে

রূপায়িত হলো না * (৮৩)। কিন্তু তিনি যে মহৎ কার্যের সূচনা করে গেলেন তা ভুলবার নয়।

* (৮৩) প্রবোধচন্দ্র সিংহ "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" পুস্তকে (পৃঃ ৬৫-৬৬) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে কেম্ব্রিজ কমিটি ব্রজেন শীলের নামের সুপারিশ সহ উপাধ্যায়ের পত্র পাবার পর এই বিষয়ে পোপের অনুমোদন কামনা করে। কিন্তু পোপের অনুমোদন না পাওয়ায় কেম্ব্রিজ কমিটিও শেষ পর্যন্ত উপাধ্যায়ের পরিকল্পনা আর গ্রহণ করতে পারলো না। উপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার জন্য পোপের কোনো পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল বলে মনে হয় না, কারণ ইংল্যাণ্ড এলিজাবেথের সময় থেকেই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট দেশ—পোপ-শাসিত ক্যাথলিক রাষ্ট্র নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাক্-স্বদেশী যুগের রাষ্ট্র-চিন্তা

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যৌবনের প্রারম্ভে নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা বিপুল ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদ বিষয়ক বক্তৃতাবলী তাঁকে অল্প বয়সেই কিরূপ ভাবিত ও উদ্দীপিত করে তুলেছিল সে কাহিনী তিনি নিজেই "আমার ভারত উদ্ধার" প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন * (৮৩ক)। সৈনিকব্রত গ্রহণের খেয়াল এই সময় কিছুদিনের জন্য তাঁকে পেয়ে বসে, পর পর দুইবার সে-পথে যাত্রাও সুরু করেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলো না। তারপর প্রায় দুই দশক তিনি ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারে ব্যাকুল হয়ে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার পরও (১৮৯১) তাঁর ভারতপ্রীতি বা স্বাজাত্যবোধ হ্রাস পেলো না। বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে, বেশভূষায় ও চালচলনে তিনি তখনও বাঙালীয়ানা ছাড়লেন না। ক্যাথলিক ধর্মাশ্রয়ী হয়েও তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিক বসন পরিহিত হলেন। সে ১৮৯৪ সনের কথা। পূর্বাশ্রমের নাম—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিত্যাগ করে তিনি নিজেকে পরিচিত করলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবন্ধু রূপে। তখন থেকে তিনি ব্রহ্মবান্ধব নামেই সমধিক পরিচিত।

ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার পর উপাধ্যায় খৃষ্টভক্ত থাকলেন

* (৮৩ ক) ঐ প্রবন্ধটি উপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্বরাজ' সাপ্তাহিকে ১২ই ও ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সালে অর্থাৎ ২৬শে মে ও ২রা জুন, ১৯০৭ সনে প্রকাশিত হয়।

বটে, কিন্তু হিন্দুয়ানী গেলো না। তাঁর জীবনব্রত হলো ক্যাথলিক ধর্ম ও বেদান্ত ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এই নেশায় ব্যাকুল হয়ে তিনি তখন যে কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন তার গুরুত্ব আজও বেশি লোক সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। প্রথমে কিছুদিন ভুলক্রমে বেদান্তবিরোধী হলেও তাঁর ধর্মনিষ্ঠ মন কখনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই শতাব্দীর শেষ দিকে দেখি বেদান্তের সপক্ষে তাঁর মনের ক্রমিক পরিবর্তন। নর্মদাতীরে জবলপুরে তিনি যে 'কাস্থলিক মঠ' স্থাপনের উদ্যোগে ব্রতী হলেন (১৮৯৯), তার মধ্যে তাঁর খৃষ্টপ্রীতি বেশি ছিল কি ভারতপ্রীতি বেশি ছিল বলা সুকঠিন। ভারতের জলবায়ু, আকাশ-বাতাস, তার নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, তার ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত ও সাধনা, তার রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের আকর্ষণ তখনও তাঁর কাছে ছিল সুতীব্র।

স্বরাজ-গড়ের স্বপ্ন দর্শন

নর্মদাতীরে নির্জন স্থানে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থান ভ্রমণকালে উপাধ্যায়ের মন ক্রমশই ভারতমুখী হয়ে ওঠে। অন্তরের গভীরে তিনি শুনতে পেলেন জাতীয় মুক্তির মন্ত্র। স্বদেশী যুগে তিনি ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখেন,

> "আমার ঘর নাই—পুত্রকলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম।...ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।...আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার

প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জন সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীর-হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। আমি নর্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আমার জপ-তপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে—স্বরাজতন্ত্রের প্রজা হইতে —আমার প্রাণ সদাই আনচান"* (৮৪)।

এই স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা স্বদেশী যুগে উপাধ্যায়ের মনে অনির্বাণ দীপশিখার মত প্রজ্বলিত ছিল। এই আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট উন্মেষ তাঁর চেতনায় দেখা দেয় নর্মদাতীরে। তিনি নিবিড় ভাবে অনুভব করলেন নর্মদাতীরের নির্জন আশ্রমে ধ্যান ধারণায় মগ্ন হওয়ার চেয়ে পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে ব্রতী হওয়াই জীবনের মহত্তর ধ্যান ও তপস্যা। তাই কলিকাতায় ফিরে এসে (১৯০০) 'সোফিয়া' (নব পর্যায়) সম্পাদনকালে তিনি প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন। সংগ্রামলিপ্ত ভারতের ও পৃথিবীর মুক্তিব্রতী মানুষদের কথা তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। নব পর্যায়ে 'সোফিয়া' পত্র মাসিক থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হলো। এর চেহারার সঙ্গে বিষয়বস্তুও পাল্টালো। এই পত্রিকা একমাত্র ধর্ম ও দর্শনঘেঁষা পত্রিকা ছিল না, একালে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—কিছুটা

* (৮৪) 'স্বরাজ' পত্রে ২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৩ সালে প্রকাশিত "স্বরাজ-গড়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতি ও কিছুটা রাজনীতি মেশানো পত্র—বলতে আমরা যা বুঝি, সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' ছিল ঠিক তাই। ঐ পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে 'টপিকস্ অব দি ডে' ও 'প্যানোরমা অব দি উইক' নামক এই দুই বিশিষ্ট অংশে দুনিয়ার রাষ্ট্রিক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ও কিঞ্চিৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য বের হতো। তাছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে প্রবন্ধ প্রকাশেরও ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময় (১৯০০) একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের সঙ্গে বুয়োরদের চলেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অন্যদিকে সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যলিপ্সু পশ্চিমা ও জাপানী শক্তির সঙ্গে চীনাদের মুক্তি-যুদ্ধ। পরাধীনতার বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি পৃথিবীর মুক্তিপিপাসু ও সংগ্রাম-লিপ্ত মানুষদের উদ্দেশে জ্ঞাপন করলেন তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিম সমবেদনা।

সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা

'সোফিয়া' সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যাতেই উপাধ্যায় ট্র্যান্সভাল্ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রেটোরিয়ার পতনে সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে যে উন্মত্ত আনন্দোচ্ছ্বাস (mad rejoicings) লক্ষ্য করেন তার উপর কটাক্ষ করে এবং স্বাধীনতাকামী বুয়োরদের ব্যর্থ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে বড় সম্পাদকীয় টিপ্পনী বের করলেন* (৮৫)। বুয়োর যুদ্ধে বিজয়লাভের পর যোশেফ্ চ্যাম্বারলিন্ বার্মিংহাম টাউন হলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আত্মপক্ষ রক্ষার ছলে ঘোষণা করেন যে, বুয়োরদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সামরিক শক্তি এক মুহূর্ত পূর্বেও প্রয়োগ করা হয়নি, কাজেই তাদের পতনের পর ইংরেজবিরোধী ধ্বংসমূলক কাজে সুযোগ দেওয়ার নিমিত্ত তাদের আর স্বাধীনতা

* (৮৫) *Sophia*, June 16, 1900, pp. 1-2

প্রত্যর্পণ করা চলে না ; ভবিষ্যতে চললেও বর্তমানে নয় * (৮৬)। ইংরেজ সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন বুয়োরদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধারম্ভের প্রথম স্তরে যখন ইংরেজদের দুর্দশার আর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, সে সময় স্বয়ং বিলাতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংরেজ জাতি এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে পররাজ্য গ্রাস ও ধনলুণ্ঠনের লিপ্সা থেকে নয়, উচ্চতম নীতিজ্ঞান ও মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই। কিন্তু যুদ্ধের গতি যতই পাল্টাতে লাগলো, ততই ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তাদের সুপ্ত পররাজ্যগ্রাস-নীতি ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যে লর্ড সলস্‌বেরী একদিন উচ্চ আদর্শের ধূয়া তুলে কথা বলেছিলেন, তিনিও প্রেটোরিয়ার পতনের পর ঘোষণা করলেন যে, বুয়োরদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে ইংরেজ প্রজাদের রক্ষা করতে গেলে তাদের আর স্বাধীনতার লেশমাত্রও দেওয়া চলে না, কারণ স্বাধীনতা দিলেই তারা আবার পূর্বেকার মত সেই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করবে। বিশুদ্ধ নৈতিকতা, এমন কি বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের দিক থেকেও ইংরেজদের এই ঘোষিত নীতি কত ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক তা উপাধ্যায় উল্লেখ করলেন। এমন কি 'ইংলিশম্যানের' মত গোঁড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদ-দাতাও পরাজিত বুয়োরদের প্রতি ইংরেজ সরকারের অনুসৃত দমন নীতি সমর্থন করতে পারলেন না। তিনিও মন্তব্য করেন, বুয়োরদের উদার রাজনৈতিক নীতি অবলম্বনের দ্বারা তুষ্ট না

* (৮৬) *Sophia*, June, 16, 1900—উক্ত সংখ্যায় "Mr. Chamberlain and the War" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় অশান্তির আগুন ধূমায়িত থাকবেই এবং ইংরেজেরা অন্য কোনো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে সেই অনুকূল আবহাওয়ায় আবার সেই অশান্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। এই সতর্কবাণীকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে উপাধ্যায় মন্তব্য করলেন যে, লর্ড সলস্‌বেরীকে বর্তমানে যে-উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে, তা সহজে যাবার নয়* (৮৭)।

বুয়োরদের প্রতি যেমন, তেমন সংগ্রামলিপ্ত চীনাদের প্রতিও উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে সমবেদনা প্রকাশ করে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করলেন। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় সরকারগণ পার্থিব বস্তু ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না এবং তারা বিদেশে ধর্মপ্রচার কার্যেও খৃষ্টান মিশনারীদের সাধারণত উৎসাহিত করে না, কিন্তু সম্পদলুণ্ঠন বা রাজ্যগ্রাসের সুযোগ দেখা মাত্র তারা নির্যাতিত মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হতে কিছুমাত্র কসুর করে না। বক্সার যুদ্ধে (১৯০০-১৯০১) পশ্চিমা শক্তিগুলির আচরণ এর পরিষ্কার প্রমাণ * (৮৮)। সম্মিলিত পশ্চিমা ও জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনাদের পতন অনিবার্য জেনেও তিনি তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা ও স্বদেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করেন * (৮৯)।

চীনাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখতে গিয়ে উপাধ্যায় খৃষ্টান

* (৮৭) "But Lord Salisbury seems to be taken of the present critical moment with a fit of midsummer madness"—উপাধ্যায়ের এই মন্তব্য 'সোফিয়া' পত্রে প্রকাশিত (২৩শে জুন, ১৯০০) "Proper Policy in South Africa" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

* (৮৮) *Sophia*, June 16, 1900, p. 2.

* (৮৯) *Sophia*, June 30, 1900, Vide the article on "The War in China".

মিশনারীদের প্রতিও তীব্র কটাক্ষ করতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, চীনের জটিল পরিস্থিতির জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা মূলত দায়ী। তাঁর মতে মিশনারীদের মধ্যেও রকম ভেদ আছে। কোনো কোনো মিশনারী সাধু ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ-দেশান্তরে গমন করে স্থানীয় বা জাতীয় ঐতিহ্যে আঘাত না করে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন, আবার এরকম মিশনারীও অনেক আছেন যাদের বিদেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীর কামান-গর্জন শোনা যায়। তাই এই সকল মিশনারীকে সেদেশের সন্তান-সন্ততিগণ বৈদেশিক আক্রমণের হাতিয়ার বলেই জ্ঞান করে এবং তা' ঠিকই করে * (৯০)। চীনারা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে খৃষ্টান মিশনারীদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করেছে তা ঘৃণ্য হলেও, মিশনারীরা যে-ভাবে স্বার্থদুষ্ট ইউরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে মিতালী স্থাপন করেছে তাও কম নিন্দনীয় নয় * (৯১)। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে আত্মত্যাগের পথ অনুসরণ না করে সরকারী শক্তির পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ মিশনারীদের পক্ষে স্বধর্ম বর্জন ভিন্ন আর কিছু নয়, আর তা চরম কাপুরুষতা ও চরম লজ্জার বিষয়।

* (৯০) "These are consequently looked upon by the children of the soil as so many emissaries of foreign aggression. And they are really so. They do not believe in their heart of hearts that there is very little hope of Europeanising China religiously—Christianity is, according to them, synonymous with Europeanising—unless she is *civilly* converted. These evangelists of the *European* Gospel are easily made tools of by the grasping statesmen". Vide *Sophia* (July 21, 1900, p. 2).

* (৯১) *Sophia*, July 21, 1900. Vide the article ' Christian Missions and the European Powers—An Unholy Alliance" (p. 4).

মডারেটপন্থী রাজনীতিপ্রিয়তা

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ভারতের রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিও এই সময় যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। ১৯০০ সনের আগষ্ট মাসে 'সোফিয়া' পত্রে তিনি লিখলেন যে, হিন্দুজাতির ধর্ম তাদের রাজানুগত্যের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ প্রয়োজন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবিলম্বে জেহাদ্ ঘোষণা করা। রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য আন্দোলন চালানো নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আপাততঃ সব থেকে বেশি জরুরী কর্তব্য হলো পাশ্চাত্য চিন্তার সম্মোহন থেকে ভারতীয় মনকে মুক্ত করা। কারণ চিন্তার স্বাধীনতাই হলো সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক সোপান * (৯২)। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, হিন্দুজাতির জীবন থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতির নির্বাসন বা বহিষ্কার এই চিন্তা আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। ভারতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য যুগপৎ হিন্দু ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রয়োজন। ইউরোপীয় চিন্তা থেকে হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী অনেকখানি স্বতন্ত্র। এক সাধনা প্রবৃত্তি-মূলক, আর এক সাধনা নিবৃত্তিমূলক। ইউরোপীয় চিন্তা যদি আমাদের স্বকীয় কৃষ্টিকে সজীব ও পরিপূর্ণ করে তুলতে সহায়ক

* (৯২) "We do not advocate rebellion in the physical realm, but in the realm of thought. We are loyal, and religiously so. Our faith obliges us to look upon the English dominion as a glorious manifestation of the Divine Sovereignty. The insurrection that we advocate is against the ascendancy of European *thought* over Hindu *thought*...Without the emancipation of our national thought from the foreign yoke the regeneration and elevation of India will be an impossible task". Vide the article on "European Dominion" in *Sophia* (August 18, 1900, pp. 6-7).

না হয়ে তার ধ্বংসসাধনে বা বিকৃতিকরণে নিয়োজিত হয়, তবে তা কখনও হিন্দুজাতির কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। কিন্তু পক্ষান্তরে ইউরোপীয় চিন্তা যেখানে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক সত্তাকে নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলতে সহায়ক হবে, সেখানে সেই চিন্তা হিন্দুজাতির কাছে বরণীয় ও গ্রহণীয়। তিনি মনে করতেন এদেশে ইউরোপীয় দর্শন আক্রমণাত্মকরূপেই আবির্ভূত হয়ে হিন্দু জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। তাই সেই আক্রমণাত্মক পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর দণ্ডায়মান হওয়া দরকার * (৯৩)।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি উপাধ্যায়ের মন ক্রমে ক্রমে ঘোর বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যে খৃষ্টান ধর্ম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর সারা ইউরোপকে নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান দেয়, সেই মহান ধর্মের নামে বর্তমানে ইউরোপীয় জাতিগুলি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের লালসায় উন্মত্ত, উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রের বহু সংখ্যায় তার নির্দয় সমালোচনা করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও তিনি রেহাই দিলেন না। তাঁর অভিমতে ইংল্যাণ্ডের প্রভাবে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ভবিষ্য উন্নতির সকল আশা নির্ভর করে ইংরেজ শাসকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে। লর্ড রিপন বা স্যার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেলের মত ব্যক্তি ভারতে যত বেশি প্রেরিত হন,

* (৯৩) "We do not at all insinuate that the Hindu system of thought is superior to that of Europe. Each is great in its own sphere. What we deplore is the dominion of the latter over the former…We do not wish the former to be annihilated or disfigured by the latter". পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ততই ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক * (৯৪)। জীবনের এই পর্বে উপাধ্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করলেও তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত ভারতীয় স্বরাজের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতাদের মত তিনিও ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতের জন্য কেবল বিশেষ বিশেষ অধিকারই কামনা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও ভারতে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলে কংগ্রেসী নেতারা এবং সেই সঙ্গে উপাধ্যায়ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। এমন কি বিংশ শতকের প্রারম্ভে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকা পরিচালনা কালেও উপাধ্যায়ের পূর্বেকার ঐ দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অটুট ছিল। ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক অধিকারের সমর্থক হলেও এখনও তিনি ইংরেজ শাসনের সম্মোহন মন্ত্র থেকে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচনাতেই তিনি লিখলেন যে, প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত, যদিও ভারতে বৃটিশ রাজের মত প্রজাপুঞ্জের সদিচ্ছার উপর এমন দৃঢ়ভাবে আর কোনো বৈদেশিক শাসন কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমরা ধর্মগতভাবে বিশ্বাস করি যে ইংল্যাণ্ডের ভারত বিজয় আমাদের উপর ঈশ্বরের শাস্তিস্বরূপ আসে নি, এসেছে পরম করুণাময় ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ * (৯৫)। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও মন্তব্য করেন

* (৯৪) *Sophia*, Oct. 20, 1900. Vide the article on "Imperialism in Christendom".

* (৯৫) We religiously believe that the conquest of India by England is not a punishment inflicted upon us by a just God, but a blessing conferred upon a down-trodden people by the All-merciful." Vide *The Twentieth Century*, January, 1901, p. 1

যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার মূল লক্ষ্য হলো শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক সুষ্ঠু ও সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করা। ভারত শাসনে ভারতবাসীদের দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেয়ে কোনো বৃহত্তর রাষ্ট্রিক লক্ষ্য তখনও উপাধ্যায়ের চেতনায় ভেসে ওঠে নি * (৯৬)। এমন কি ১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি "Do We Love the English?" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতেও তাঁর ইংরেজ শাসনের প্রতি গভীর আস্থা লক্ষণীয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইংরেজকে বাদ দিয়ে ভারতের চলতে পারে না। ভারতবাসী এখনও এতই দুর্বল যে তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ইংরেজশাসন মুক্ত হওয়া অসম্ভব ("We cannot now do without them. We are too weak to be independent.")। ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল হলেও এই সময় উপাধ্যায় ভারতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ঐ একই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন যে, ইংরেজরা ভারতে নিজেদেরকে ক্রমশই অবাঞ্ছিত করে তুল্ছে। এদেশে তাদের উদ্ধত আচরণ ও চালচলন ভারতবাসীর পক্ষে বরদাস্ত করা মুস্কিল। ভারতীয়দের সঙ্গে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করা তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাদের সঙ্গে এদেশবাসীর সত্যকার সৌহার্দ্য স্থাপনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো তাদের চরিত্রগত উদাসীনতা (stolidity)। যাদের তারা শাসন করে তাদের

* (৯৬) "The children of the soil must have a responsible share in the government of the country, that the implicit faith in the benevolence of British rule may be unfolded and the harmony of popular rights with British supremacy established for good." Vide *The Twentieth Century*, January. 1901, p. 1

চিৎকার নিজেদের কর্ণকুহরে বড় সহজে প্রবেশ করে না। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ—যে বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূলকেও কম্পিত করে তোলে—সেই অঘটন সংঘটিত হবার অব্যবহিত পূর্বেও চিত্রলের ইংরেজ অফিসারগণ পোলো খেলায় বিভোর ছিল। ইংরেজ শাসকেরা যেভাবে আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারিয়েছে, তাও তাদের ঐ উদাসীন মনের পরিচায়ক। তারা বাস্তব অবস্থার প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে বলেই আয়ার্ল্যাণ্ডে "হোমরুল" বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে। ভারতবর্ষেও সেই একই দুঃখজনক দৃশ্য নজরে পড়ে। এখানকার জনসাধারণ ক্রমশই মানসিকভাবে ইংরেজ প্রভুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কথা নয় বাদই দিলাম; সমগ্র ইংরেজ জাতির দিকে তাকালেও তাদের জন্য আমাদের অন্তরে ভালবাসার কোনো তাগিদ বা উৎসাহ বোধ করা যায় না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপাধ্যায় তখনও ভারতে ইংরেজ শাসনকে উপায়ান্তর না দেখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখলেন, আমরা বড়ই দুর্বল, বড়ই দরিদ্র। ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবন চলতে পারে না। ইংরেজানুগত্য আমাদের পক্ষে বিলাসের সামগ্রী নয়, নিতান্ত প্রয়োজনের বস্তু। ইংরেজ জাতিকে উদ্দেশ করে তিনি আরও মন্তব্য করেন—তোমাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করি, কারণ তোমরা আমাদের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখো না, কারণ তোমরা আমাদের বিষয়ে সাড়াহীন। তোমরা ভারতে নিশ্চয়ই সর্বপ্রধান থাকবে, থাকা উচিতও, কিন্তু আমরা আইনানুমোদিতভাবে ও নৈতিক চাপ দিয়ে তোমাদের বাধ্য করবো যাতে তোমরা আমাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ গ্রহণ করে

রাজত্ব চালাও* (৯৭)। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কংগ্রেসী নেতাগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও মোটের উপর এই মনোভাব থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি বিপিনচন্দ্র পালকেও এই মতের প্রতিনিধি দেখতে পাই * (৯৮)। অতএব দেখা গেল যে, ভারতীয় রাজনীতি-চর্চায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বর্তমান শতাব্দীর উষালগ্নেও ছিলেন মডারেটপন্থী এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক বৈধতায় বা মূলগত সার্থকতায় তখনও তিনি বিশ্বাসী। ইংরেজ শাসনের প্রতি উপাধ্যায়ের এবং সেইসঙ্গে বাঙালী জাতির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-০৬)।

* (৯৭) "We are weak, we are poor. We cannot live without England. Loyalty is not a luxury with us ; it is a necessity of our being. We quarrel with you because you are stolid and you do not care to consider with deference our growing aspirations. You must and should remain supreme but we will make you, by constitutional and moral pressure, govern us through the counsels of our representatives." Vide the article on "Do We Love the English ?" in *The Twentieth Century* (Dec. 1901).

* (৯৮) বর্তমান লেখকদের *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (Calcutta, 1958, pp. 11—17) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি

১৯০৩ সনের জুলাই মাসে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বিলাত থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশী আন্দোলন তখনও সুরু হয় নি, কিন্তু স্বদেশী ভাবের উন্মেষ চারিদিক থেকে দেশের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠ্‌ছে। এমন সময় বাংলার যুবগণকে স্বদেশী ভাবে উদ্বুদ্ধ করবার সাধনা যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি ছিল সর্বাগ্রগণ্য *(৯৯)। ১৯০২ সনের জুলাই মাসে কলিকাতায় এই সোসাইটির জন্ম। দেশের যুবসমাজকে স্বদেশী ব্রতে অনুপ্রাণিত করাই ছিল এর সর্বপ্রধান লক্ষ্য। অনুরূপ আদর্শ উপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত আয়তনে'র পশ্চাতেও বর্তমান ছিল। উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনার ভার এতদিন ন্যস্ত ছিল তাঁর প্রধান শিষ্য রেবাচাঁদের উপর। রেবাচাঁদ ক্যাথলিক খৃষ্টান। উপাধ্যায় শুধু রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান নন, তিনি হিন্দু বৈদান্তিকও। 'সারস্বত আয়তন' স্থাপিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শে। এখানে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও গৃহীত হলো। উপাধ্যায়ের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ নিয়ে রেবাচাঁদের বিরোধ দেখা দেয় ও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সে ১৯০৪ সনের কথা। এর পর উক্ত বিদ্যালয়ের কর্মভার অর্পিত হয় পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ও প্রবোধচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের উপর। এইভাবে কিছুদিন চলবার পর বিদ্যায়তনটি বন্ধ হয়ে যায়।

বিলাত-ফেরৎ উপাধ্যায়ের চরিত্র ও মেজাজ পূর্বের থেকে বেশ

* (৯৯) "জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়", পৃষ্ঠা ৪২-৬৭।

কিছু স্বতন্ত্র। তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু কট্টর জাতীয়তাবাদী। এখন তিনি শুধু বৈদান্তিক নন, তিনি রাজনীতিপ্রিয়, তিনি বিপ্লবীও। ফিরিঙ্গি সভ্যতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চাইলেন। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। অদ্ভুত তাঁর চেহারা ও চলার ভঙ্গি। খালি পা আর খালি গা। পরণে শুধু গেরুয়া কাপড়, আর গায়ে গেরুয়া চাদর। "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" এই মেজাজে গঠিত তাঁর চরিত্র। ডন সোসাইটিতে তাঁকে প্রথম বক্তৃতা করতে দেখা যায় ১৯০৪ সনে। তাঁকে দেখে ও তাঁর বক্তৃতা শুনে ঐ সোসাইটির সভ্যগণ মুগ্ধ হয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "এঁকে (অর্থাৎ ব্রহ্মবান্ধবকে) আমি ডন সোসাইটিতে দেখি ১৯০৪ সনে। সতীশবাবু একদিন ব্রহ্মবান্ধবকে বক্তাভাবে নিয়ে এসেছিলেন। 'জেনারাল ট্রেণিং' বা সাধারণ সংস্কৃতি বিভাগে বক্তৃতা হ'ল। ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯০২)। তার ফলে বিলাতে এই বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। ব্রহ্মবান্ধবের কাছে এই খবরটা পাওয়া গেল। তা ছাড়া তিনি বিলাতী বক্তৃতার কিঞ্চিৎ চুম্বকও দিলেন।
>
> "ব্রহ্মবান্ধব হেগেলের তর্কপ্রণালীর সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা সাধন করেছিলেন। একালে আমি যাকে 'দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ' বলি ব্রহ্মবান্ধব তাকে 'অপবাদ-ন্যায়' বলেছিলেন।... শুন্‌লাম,—পশ্চিমারা কদর করে একমাত্র ভোগ। ত্যাগের ধার তারা ধারে না। হিন্দু-সংস্কৃতি একমাত্র ভোগপন্থীও নয় আবার একমাত্র ত্যাগপন্থীও নয়। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হচ্ছে ভারতীয় সনাতন আদর্শ। এইখানেই হেগেল-প্রচারিত 'সিনথেসিস' (সমন্বয়)।
>
> "ঐ প্রথম দেখলাম। গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতা। কাছা খোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই,—গেরুয়া চাদর।

এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনো আমি বিবেকানন্দী দলের কোনো স্বামীজিকে দেখিনি। সতীশ-বাবু ফকীর বটে,—কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালী সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাব-ভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল,—ব্রহ্মবান্ধব সতীশবাবুর পরবর্তী ধাপ। অনুকরণযোগ্যও বটে। তাঁর চোখের আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোক্‌টা চব্বিশ-ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মতন মানুষ" * (১০০)।

উপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

১৯০৪ সনে উপাধ্যায়ের জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" সম্বন্ধে রেভারেণ্ড জে, এন্, ফারকুহারের (Rev. J. N. Farquhar) সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবেশ। রেভারেণ্ড ফারকুহার তাঁর "গীতা অ্যাণ্ড গস্‌পেল্" (*Gita and Gospel*) নামক পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসঙ্গত ও বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করলে এদেশের অনেকেই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ফারকুহারের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেবার জন্য যোগ্য পণ্ডিত সন্ধান করতে থাকেন। উপাধ্যায় সেদিন সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এলেন ফারকুহারের বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দেবার জন্য। এই সময় উপাধ্যায়কে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা কল্পে একাধিক বার বক্তৃতা করতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে বাছাই-করা শ্রোতৃবর্গের সামনে "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" সম্বন্ধে বাংলাতে বক্তৃতা করলেন। ঐ বক্তৃতা পরে "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রের

* (১০০) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ২৮১-৮২

পঞ্চম খণ্ডে (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১ সালে) মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধের প্রারম্ভে উপাধ্যায় লিখলেন,

> "হিন্দুর অদ্বৈতজ্ঞান, আশ্রমধর্ম, নিষ্কাম নীতি, প্রতীকোপাসনা—এবংবিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সকলের নিন্দা করা এই শ্বেতাঙ্গ প্রচারকদিগের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের নামে তাঁহাদের কোপবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছেন যে, শাখাপ্রশাখা কর্তন না করিয়া মূলোচ্ছেদ করিলে তাঁহাদের কৃত বিনাশকার্য সহজেই সুসাধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুত্বের জীবন্ত মূল" * (১০০ক)।

ঐ বক্তৃতায় উপাধ্যায় ফারকুহার ও সমগোত্রীয় খৃষ্টান মিশনারীদের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করতে প্রয়াসী হলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের মতে, প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ নামে কোনো ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন না; দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণকে 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি' বলে মেনে নিলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তিনি ছিলেন 'দুশ্চরিত্র'; তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরে গীতা লিখিত হয়েছে। "অতএব গীতা, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে। সুতরাং গীতা, তাঁহার শিক্ষা হইতে পারে না।" চতুর্থত, "শ্রীকৃষ্ণ, সম্ভবতঃ, একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিন্তু তিনি অবতার নহেন। কৃষ্ণের অবতারত্ব, গীতাকারের কল্পনাপ্রসূত।" উপাধ্যায় আরও লিখলেন যে, ফারকুহার বর্তমানে আবার আর এক নতুন সুর তুলেছেন এই বলে যে,

> "মনুষ্যহৃদয়, স্বতঃই চায় যে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সেই আকাঙ্ক্ষা, গীতায় সমুজ্জ্বলভাবে

* (১০০ক) উপাধ্যায়ের "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" শীর্ষক সুদীর্ঘ রচনাটি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ প্রামাণিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাকার—তিনি যিনিই হউন না কেন - অবতীর্ণ ত্রাণকর্তৃলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা, ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছে। গীতাতে যে অবতারতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে, তাহা জিশুকৃষ্টের জীবনেই সমগ্রূপে সংলগ্ন হয়। কৃষ্ণের সহিত গীতার কোন সম্পর্ক নাই। গীতাকার, কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া জিশুকৃষ্টেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি জিশুকৃষ্টকে জানিতেন না; তাই কৃষ্ণকে কল্পনাতে অবলম্বন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, গীতা, জিশু সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী। গীতার ভাব জিশুতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে"* (১০০খ)।

অবতরণিকায় এই সমস্ত বিবিধ অভিযোগ উত্থাপনের পর উপাধ্যায় সেগুলির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হলেন। উপাধ্যায় বিচার করে দেখালেন যে,

"গীতার ভাব—গীতার কথা—যিনি জিশুকৃষ্টে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি হিন্দু ও কৃষ্টীয়ান উভয় শাস্ত্রই বুঝেন না। দ্বিতীয়তঃ অবতরণ সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা—আর কৃষ্টীয়ানদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গীতা শিক্ষা দেন—ভগবান, দুষ্কৃতদিগের শাসনার্থ, সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কৃষ্টীয়ানেরা বলেন—ভগবান, একবারমাত্র মনুষ্যপ্রকৃতি-ধারণপূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন। গীতার শিক্ষানুসারে অবতার শব্দ গ্রহণ করিলে, জিশু, অবতার-পদবাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার আবির্ভাবতত্ত্ব, সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। পর্কাহার প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ, জিশুকে গীতার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবিষ্ট করাইবার যে উদ্যোগ করিতেছেন তাহা সর্বশাস্ত্রবিরোধী।"

অতঃপর গীতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে উপাধ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন,

*(১০০খ) "Rightly read, the Gita is a clear-tongued prophecy of Christ, and the hearts that bow down to the idea of Krishna are really seeking the incarnate son of God." Vide *Gita and Gospel.*

> "শঙ্করাচার্য স্বকীয় গীতাভাষ্যের উপোদ্ঘাতে বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যাসদেব, শ্লোকাকারে পরিণত করিয়াছেন।' ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শঙ্করের মতে গীতা, ঠিক্ শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে; অথচ উহা তাঁহারই শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের ঠিক্ মুখের কথা নহে বলিয়া, গীতা, তাঁহার শিক্ষা নহে—এরূপ তর্ক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়।"

পরিশেষে উপাধ্যায় তাঁর ঐ বক্তৃতায় খৃষ্টান মিশনারীদের শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব অস্বীকারের যে প্রচেষ্টা তার কঠোর ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেন এবং তাঁদের চিন্তার অসারতা দেখিয়ে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপাধ্যায় এর পর কলিকাতার 'অ্যাল্‌বার্ট হলে' ইংরেজীতে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করলেন (২৫ শে জুলাই, ১৯০৪)। তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ও 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ ঘোষ (N. N. Ghose) ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অ্যাল্‌বার্ট হলটি সেদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। ঐ বক্তৃতায় উপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও সাধনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করলেন। ফারকুহারের বিরুদ্ধে নানা সাক্ষ্য প্রমাণ খাড়া করে তিনি প্রদর্শন করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে খৃষ্টান মিশনারীদের মতবাদ কতখানি অন্তঃসারশূন্য। ঐ বক্তৃতার বিবরণ ১লা আগষ্ট, ১৯০৪ সনের 'টেলিগ্রাফ' (*Telegraph*) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল * (১০০গ)।

* (১০০গ) বিংশ শতকের সূচনায় শ্রীকৃষ্ণ ও গীতাতত্ত্ব সম্বন্ধে খৃষ্টান মিশনারীদের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বামী অভেদানন্দের কণ্ঠ থেকেও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দের *Great Saviours of the World* পুস্তক (পৃষ্ঠা ৩৫-৮২) এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

'সন্ধ্যা' পত্রের সম্পাদনা

উপাধ্যায়ের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ১৯০১ সনের গোড়ার দিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পত্রে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যই প্রধানত ঠাঁই পেতো। ১৮৯৭ সনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন' পত্রিকাও ছিল মূলত সংস্কৃতিমূলক। এমন কি, ১৯০১ সনের শেষ ভাগে প্রবর্তিত বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' (*New India*) সাপ্তাহিকও প্রথম স্তরে (১৯০১-১৯০৩) রাজনীতি-ঘেঁষা ছিল না। বাংলার রাজনীতিতে তখনও প্রত্যক্ষভাবে বিপিনচন্দ্র বা অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটেনি। সুরেন্দ্রনাথের দৈনিক 'বেঙ্গলী' (*Bengalee*) পত্র রাজনীতির চর্চায় উৎসাহী ছিল বটে, কিন্তু সেই পত্রিকা ছিল পুরানো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক। এমন দিনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্বীয় প্রচেষ্টায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন। ১৯০৪ সনের নবেম্বর মাসে 'সন্ধ্যা' দৈনিক প্রতিষ্ঠিত হলো। 'সন্ধ্যা'র অনুষ্ঠান-পত্রে উপাধ্যায় লিখলেন ঃ

> "রাজা ম্লেচ্ছ।...উপজীবিকার জন্য, মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে।...রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে।...ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশবিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলা-কৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা

শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্মের ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতিমর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া বাজিতেছে" * (১০১)।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। মূল্য মাত্র এক পয়সা। মেঠো, গ্রাম্য, সহজ ও সরস সর্বজনবোধ্য ভাষায় এর প্রবন্ধগুলি লিখিত হলো। সন্ধ্যার উপাধ্যায় ক্রমশই উগ্র জাতীয়তাবাদের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফিরিঙ্গি সমাজ ও সভ্যতার কদর্য স্বরূপ উদ্ঘাটনে সম্পাদকের সকল শক্তি নিয়োজিত হলো। ইংরেজিনবীস বাঙালী বাবুকেও তিনি কশাঘাত করতে সঙ্কোচ বোধ করলেন না। "তাঁহার উদ্দেশ্য—তিনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রচার করিবেন; লোককে 'সন্ধ্যা' পড়াইবেন। হইল তাহাই। ট্রামের কণ্ডাক্টর, দোকানী, পশারী,—সন্ধ্যার সময় সকলকেই 'সন্ধ্যা' পড়িতে হইত। উপাধ্যায় য়ুরোপীয়দিগকে 'ফিরিঙ্গী' বলিতেন। সময় সময় তাঁহার কথা সাধারণ শিষ্টাচারসীমা লঙ্ঘন করিত। তাঁহার ফিরিঙ্গীবিদ্রূপের উদ্দেশ্য ছিল ফিরিঙ্গীকে দেখিলে ভারতবাসীর যে বহুদিনের প্রকৃতিগত ভয়, সে ভয় ভাঙা"* (১০২)। উপাধ্যায় এদেশবাসীর সে বদ্ধমূল ভয় ভেঙেছিলেন। শক্তিমত্ত ইংরেজ শাসকজাতির প্রতি আমাদের যে জন্মগত সমীহ ও সম্মোহন তার ভিত্তিমূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। 'সন্ধ্যা' পত্রে প্রকাশিত উপাধ্যায়ের

* (১০১) প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" পুস্তকের ৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় "সন্ধ্যার" এই অনুষ্ঠান-পত্রটি মুদ্রিত আছে।

* (১০২) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" পুস্তক (কলিকাতা, ১৯২৮, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০) দ্রষ্টব্য।

"গোদা পা'র ভোঁথা লাথি" আজও স্মরণীয়। ইংরেজের শক্তি-সামর্থ্যকে তিনি সর্বদা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। শাসকজাতির শক্তির স্ফীতিকে তিনি গোদা পা'র শক্তির সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন। জাতির মানসিক দৌর্বল্য ও ক্লৈব্যের প্রতিও তাঁর ঘৃণা ছিল অন্তহীন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ধর্মের নামে সাত্ত্বিকতার আবরণে সারা দেশটা ভীরুতা ও তামসিকতায় নিমজ্জিত। তিনি সেই বহু-দিনের অভ্যস্ত নিরাপদ তমোভাবকে নিষ্করুণভাবে আঘাত করলেন, নিস্তেজ জাতির প্রাণে নবরক্তধারা সঞ্চার করে তাদের কণ্ঠে দিলেন স্বাধীনতার অগ্নিগর্ভ মন্ত্র। বিবেকানন্দী বিক্রম নিয়েই তিনি সেদিন যোদ্ধার বেশে জাতীয় জীবনমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন। তিনি লিখলেন :

> "তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাব্‌কাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না।...দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না...রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে" * (১০৩)।

উপাধ্যায়ের যেমন সঙ্কল্প, তেমন কাজ। একদিকে শক্তি-মদোন্মত্ত ইংরেজ বা ফিরিঙ্গিকে অন্যদিকে তমোভাবাপন্ন, নিস্তেজ, ভীরু স্বজাতিকে দিনের পর দিন 'সন্ধ্যা' পত্রে কশাঘাত করতে লাগলেন। তাঁর চাবুক খেয়ে সেদিন বাঙালী জাতির মোহ ভঙ্গ হয়েছিল। প্রবীণ সাংবাদিক, স্বদেশী যুগে উপাধ্যায়ের সহকর্মী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ;

* (১০৩) প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" (পৃষ্ঠা ৮৯) দ্রষ্টব্য।

> "উপাধ্যায়ের কৃত কার্য আমাদের রাজনীতির বেলায় সাগরোর্মির আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গলা দৈনিক পত্র হাজারে হাজারে দশ হাজারে দশ হাজারে বিকাইতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহার মূল। ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি বয়কটের প্রধান পুরোহিত। সেই নির্ভীক—নিঃস্বার্থ ত্যাগীর আদর্শ একদিন দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল" * (১০৪)।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখেছিলেন :

> "It was this sturdy patriot, whose almost unaided exertion has brought the people of Bengal to a practically resistful attitude today. Of all men it was he who had imparted a militant character to our Swadeshi movement."

অর্থাৎ "এই নির্ভীকপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিকের প্রায় একক চেষ্টার ফলে বাঙালী জাতির দৃষ্টিভঙ্গি আজ সংগ্রামসুলভ হয়ে উঠেছে। সকল নেতার মধ্যে তিনিই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে একটা উগ্র, সংগ্রামাত্মক মনোভাব সঞ্চার করেছেন" * (১০৫)।

উপাধ্যায়ের স্বরাজ-সাধনা

১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ছিল জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন। উপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। এ স্বরাজ শুধু শিক্ষা-নীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। এর মধ্যে রাষ্ট্রিক

* (১০৪) "কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ১২১
* (১০৫) *Bande Mataram*, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ২৪শে নবেম্বর, ১৯০৭ দ্রষ্টব্য।

স্বাধীনতার সুরও ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ভারতের জন্য স্বরাজ কামনা করেছিলেন এই কারণে যে, স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারত আবার জগৎসভায় স্বীয় গৌরবের আসন অধিকার করতে পারবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত পরাধীন ভারতের কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ভারতের স্বরাজ সাধনাকে তিনি একটা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন। এই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি ছিল বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী। এইখানে বিপিন পাল ও অরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শনের সঙ্গে উপাধ্যায়ের চিন্তা-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিপিন পাল স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টত আধ্যাত্মিক আন্দোলন ("spiritual movement") বলে বিশেষিত করেছিলেন * (১০৬)। অরবিন্দও ঠিক তাই। তাঁরা উভয়েই ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ কামনা করেন, কারণ স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারতবাসীর পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশ সম্ভব হবে। নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও বৃহত্তর আদর্শের দ্বারা তাঁরা দুজনেই স্বরাজ আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন * (১০৭)। 'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায়ও একই ভাবের ভাবুক। বৃহত্তর লক্ষ্যবর্জিত নিছক রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনকে তিনি ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ বলে স্বীকার করেন নি। 'সন্ধ্যা' পত্রে তিনি লিখলেন : "রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্ত্ব বসে না, তাই রজঃ

* (১০৬) বর্তমান লেখকদের *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (কলিকাতা, ১৯৫৮) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

* (১০৭) বর্তমান লেখকদের *Sri Aurobindo's Political Thought* (কলিকাতা, ১৯৫৮) পুস্তক এবং "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" (কলিকাতা, ১৯৬১) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চাই। শেষে সত্ত্ব। সত্ত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত হওয়াই শেষ—নির্বাণমুক্তি" * (১০৮)। এই চরম মুক্তির প্রয়োজনীয় সোপান হিসাবেই তিনি ভারতের জন্য রাষ্ট্রিক স্বরাজ কামনা করেছিলেন।

নব রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার

মডারেটপন্থী দেশনায়কদের কল্পিত "স্বরাজ" থেকে উপাধ্যায়-বাঞ্ছিত "স্বরাজ" ছিল ভিন্ন বস্তু। বৃটিশ কমনওয়েল্থের অন্তর্ভুক্ত কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন তিনি ভারতের জন্য অনুমোদন করতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দের ন্যায় তিনিও চেয়েছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যিক সম্পর্কশূন্য ভারতের পূর্ণ স্বরাজ। এখানেই ছিল সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটপন্থী রাজনীতি-বিদ্দের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বিরোধ। স্বদেশী আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বাংলার রাজনীতিতে যে "একষ্ট্রিমিষ্ট" বা "ন্যাশান্যালিষ্ট" অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে, তার অন্যতম প্রধান পাণ্ডা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। মডারেট নেতাদের পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন—আবেদন-নিবেদনের পথে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন—তিনি ভ্রমাত্মক বিবেচনায় বর্জন করেছিলেন। রাজনীতিক সংগ্রামকে তিনি মনে করতেন পরস্পর-বিরোধী দুই শিবিরের লড়াইমাত্র। ভিক্ষার দ্বারা, আবেদনের দ্বারা কোনো জাতি কখনও বিদেশী শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে পারে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পরাধীন জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব আপোষহীন সংগ্রাম ও চরম আত্ম-বলিদানের

* (১০৮) প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব", পৃষ্ঠা ৮৯ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা* (১০৯)। তাই তিনি গতানুগতিক আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করলেন "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" বা বয়কটের পথ। বয়কট দর্শনের মূল কথা ছিল বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে জাতীয় জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিষ্ঠুর ও বিরামহীন অসহযোগ। ১৯০৫-০৬ সনে বাংলার রাজনীতিতে বয়কট দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

১৯০৫ সনের মধ্যভাগে বঙ্গদেশ বিভাগের নিমিত্ত সরকারী পক্ষের কর্মপ্রচেষ্টা দানা গেঁথে ওঠে। ১৯শে জুলাই সিমলা থেকে সরকারী ইস্তাহারে ঘোষিত হলো আগামী ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগের দিন ধার্য হয়েছে। ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলা দেশে এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়। বাংলা দেশে এমন কোন শহর বা মফঃস্বল ছিল না যেখান থেকে কার্জনী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়নি * (১১০)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকার যখন বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনায় কৃতসঙ্কল্প থাকলো, তখন বাঙালী জাতি ক্রোধে উন্মত্ত ও ক্ষোভে মরীয়া হয়ে ওঠে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ সনে কলিকাতার প্রকাশ্য সভায় 'স্বদেশী'র নামে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হলো। বিদেশী বর্জন নীতি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না, তার ভাব ও আদর্শ জাতীয় জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রেই বিস্তৃত

* (১০৯) ১৯০৫ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে উপাধ্যায় রচিত ও বহুল প্রচারিত "সোনার বাঙ্গালা" পুস্তিকা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে "File No. 477 of 1907" নামে যে ফাইল রক্ষিত আছে, তা পঠিতব্য।

* (১১০) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লেখকদের *India's Fight For Freedom* গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯৫৮, প্রথম অধ্যায়ে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হলো* (১১১)। বাংলার যৌবনশক্তি সহসা চঞ্চল হয়ে উঠ্লো। বাংলার তরুণদল স্বদেশী ব্রত গ্রহণে কারো থেকে পশ্চাৎপদ রইল না। বস্তুত, তাদেরই অফুরন্ত উৎসাহে ও কর্মপ্রচেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলন দ্রুতবেগে শহরে মফঃস্বলে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে স্বকীয় পথে জাতীয় আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করতে ব্রতী হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সর্বান্তঃকরণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। বয়কট ও স্বদেশীর সপক্ষে নিয়মিতভাবে 'সন্ধ্যা' পত্রে তাঁর হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে বাংলার আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত। জাতীয় ইতিহাসে এমন উন্মাদনা ইতিপূর্বে এদেশে আর কখনও দৃষ্ট হয় নি। স্বদেশী সভায় যোগদান ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ থেকে বাংলার ছাত্র সমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে সরকার শীঘ্রই দমননীতির আশ্রয় নিল। সরকারী নির্দেশে একমাত্র রংপুরের দুই বিদ্যালয় থেকেই দেড়শতাধিক ছাত্র বহিষ্কৃত হলো। সরকার নিয়ন্ত্রিত বিজাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের প্রশ্ন এবার সজোরে উত্থিত হলে উপাধ্যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদীঘির গোলামখানা" আখ্যা দিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করে জাতীয় স্বার্থে, জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা এই সময় বাংলাদেশে স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনকে উপাধ্যায় সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। এই বিষয়ে তিনি ছিলেন তৎকালের

* (১১১) ডক্টর প্যান্সী ছায়া ঘোষ তাঁর *Indian National Congress* বইয়ে (কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১২৮-১৪২) "স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে"র যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের *India's Fight For Freedom* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠ ভাবুকদিগের অন্যতম। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক। সেই সতীশচন্দ্রের সঙ্গেও অন্যান্য ব্যাপারে তৎকালে উপাধ্যায়ের নিবিড় সংযোগ ছিল।

সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সতীশচন্দ্র ও উপাধ্যায় এক বাড়ীতে একত্রে বহুদিন বসবাস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকারের বিবরণ প্রণিধানযোগ্য।

"১৯০৫ সনের জুন মাসে রাধাকুমুদ, আর রবী ঘোষের সঙ্গে আমিও ইডেন হিন্দু হষ্টেল ছেড়ে দিই। সতীশ বাবুর তদ্‌বিরে আমরা তাঁর তিন পেটোআ নতুন এক মেসের ব্যবস্থা করি। সেই মেসের কর্মকর্তা হন ব্রহ্মবান্ধব। তখন ব্রহ্মবান্ধব সারস্বত আয়তন নামে একটা ইস্কুইলা ছেলেদের পাঠশালা চালাতেন। তাঁর সঙ্গে এলেন পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। এরা দুজনেই সতীশ-মণ্ডলের অন্তর্গত হ'য়ে গেলেন।...

"কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ছিল ঠিকানা। একটা বড় বাড়ী। নাম ছিল তার রাজবাড়ী। ঢুকতে হতো শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর পূব্‌দিকে ছিল মাঠ...তাকে লোকেরা বল্‌তো 'পান্তের মাঠ'। মাঠের দক্ষিণেই মেট্রোপলিটান কলেজের পেছনটা। আমরা থাকৃতাম দোতলায়। ঘর থেকে পশ্চিমে দেখ্‌তাম মাঠ আর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, আর দক্ষিণেও মাঠ এবং মেট্রোপলিটান কলেজ।

"বঙ্গ-বিপ্লবের অনেক-কিছু ঘটৃত এই সাম্‌নের মাঠে। সবই আমরা ঘরে ব'সে দেখ্‌তাম। সভায় হাজির থাকার দরকার হতো না। তবে সভায় যা-কিছু ঘটৃত তার বেশ-কিছু আমাদের বাড়ীরই ঘরগুলায় আর এক-তলায় আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকৃত। কেননা সতীশ বাবু আর ব্রহ্মবান্ধব এই দুজনের শলা স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে হামেশা জরুরি হতো। প্রকারান্তরে

বলা চলে যে, বঙ্গ-বিপ্লবের 'গ্রীণ রুমে' বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবী আর সামাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর গৌরবময় দিন, সপ্তাহ বা মাসগুলা কাটিয়েছি তখন আমাদের আত্মিক অভিভাবক সতীশ বাবু আর ব্রহ্মবান্ধব। ১৯০৬ সনের জুন পর্যন্ত এইভাবে কাটে। তখন সতীশ বাবুর সঙ্গে আমরা ৩৮।২নং শিবনারায়ণ দাসের গলির বাড়ীতে উঠে যাই। সেখানে আর ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে মেসের সংশ্রব ছিল না" * (১১২)।

তখন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন পুরাদমে চলেছে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনও। সতীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের নিয়ে তখন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে আত্ম-সমাহিত; উপাধ্যায়ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মারফৎ জাতির মুক্তি-সাধনায় নিমগ্ন।

সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী প্রতিনিধি, কিন্তু একজন ছিলেন অন্যজন থেকে একেবারে পৃথক। সতীশচন্দ্র শান্ত, সমাহিত, নিঃশব্দ, গঠনমূলক কর্মে লিপ্ত। উপাধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত, গতিশীল, সশব্দ ও গর্জনমুখর। রাজনীতি-চর্চায় সতীশচন্দ্রের ভূমিকা অপ্রত্যক্ষ ও গৌণ; উপাধ্যায়ের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও প্রোজ্জ্বল। বিপ্লবের অগ্নিশিখা উপাধ্যায়ের অন্তরে প্রজ্বলিত। আত্মশক্তির দ্বারা, সংঘবদ্ধ বয়কট বা প্রতিরোধের দ্বারা ভারতের স্বরাজ লাভে তিনি ব্রতবদ্ধ। বিপিনচন্দ্র ১৯০৫ সনের শেষভাগ থেকেই বাংলার রাজনীতিতে যুগপ্রবর্তকের মূর্তিতে সজোরে আবির্ভূত হতে থাকেন। ১৯০৬ সনের মধ্যভাগে তিনি বাংলার এই নব্য জাতীয়তাবাদী দলের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক। এমন সময় অরবিন্দ ঘোষও ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের ন্যায় সহসা আবির্ভূত হয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক স্বর্ণযুগের উদ্বোধন

* (১১২) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫ দ্রষ্টব্য।

করেন। বিপিনচন্দ্র একই সঙ্গে সুবক্তা ও সুলেখক। অরবিন্দ শুধুমাত্র লেখক, কিন্তু সেই লেখনীর শক্তি তরবারির অপেক্ষাও ভয়াবহ। তবুও তাঁদের চিন্তার আবেদন শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সীমাবদ্ধ থাক্‌লো ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের নিকট। কিন্তু নব্য রাজনীতিক আদর্শ প্রচারে উপাধ্যায় আরও বহুদূর অগ্রসর হলেন। শিক্ষিত শ্রেণীর বোধগম্য ও আদরণীয় গুরু-গম্ভীর ভাষা ক্রমশঃ তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রে পরিত্যক্ত হলো। দেশের স্বল্প-শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য এমন সহজ ও সরস ভাষা উপাধ্যায় সৃষ্টি করলেন যে তা' শীঘ্রই বঙ্গসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হতে লাগলো। 'সন্ধ্যা'র ভাষা পাঠ করে সেকালে "দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত" * (১১৩)।

১৯০৬ সনে বাংলা দেশে পুরাতন রাজনীতিবিদগণের আপোষ-মূলক মনোভাবে ও আচরণে বিরক্ত হয়ে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের নেতৃত্বে নব্য জাতীয়তাবাদীর দল গড়ে উঠ্‌তে থাকে। ১৯০৫ সনের শেষভাগে 'জাতীয় শিক্ষা'র প্রসঙ্গ নিয়ে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব প্রথমে দেখা দেয়, পরে ১৯০৬ সনে 'স্বরাজে'র প্রশ্ন নিয়ে এই সৃষ্টিমূলক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। 'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায় নব্য জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পুরোহিত। নব্য জাতীয়তাবাদী দলের

* (১১৩) প্রবোধচন্দ্র সিংহের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব", পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে আবার যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের অনুগামী,—যেমন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি,—তাঁরা ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে স্থাপন করলেন বাংলা 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক। ঐ মাসেই আবার কলিকাতায় বাংলার অগ্রণী মনীষীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (National Council of Education)। উপাধ্যায় এই শিক্ষা আন্দোলনেরও অন্যতম নায়ক ছিলেন।

বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ

জাতীয় ইতিহাসে এর পরবর্তী ঘটনা বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (এপ্রিল ১৪-১৫, ১৯০৬)। বাংলার সকল জেলা থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ বরিশালে মিলিত হলেন। উপাধ্যায়ও ঐ সম্মেলনে বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে অধিবেশন সুরু হয়, কিন্তু সভার কার্য বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলো না। সরকারী চণ্ডনীতির তাণ্ডবে যুবক-বৃদ্ধ অনেকেই আহত হলেন, জোরপূর্বক সভাও ভেঙ্গে দেওয়া হলো। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধৃত হলেন। তাঁর জরিমানা হলো। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "বালকের রক্তে ও পুলিশের কলঙ্কে বরিশালের অসমাপ্ত অধিবেশন বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল"* (১১৪)।

বরিশালে সুরেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মনোভাবে দেশের নবীন-প্রবীণ

* (১১৪) "কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ১৪৩ দ্রষ্টব্য। বর্তমান লেখকদের *India's Fight For Freedom* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৫৬-১৬৭) বরিশাল কনফারেন্সের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে।

উভয় দলই সন্তুষ্ট হলো। জাতীয় জীবনে মডারেট দলের ক্ষুণ্ণ প্রভাব ও সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মর্যাদা আবার লোকচক্ষে বৃদ্ধি পায়। নব্য জাতীয়তাবাদী ও মডারেট নেতৃবৃন্দের মিলনের সম্ভাবনাও সাময়িকভাবে দেখা দিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ-ভক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) 'হিতবাদী' পত্রে নব্য জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করলেন। সেই চিত্রে দেখানো হলো যে, লাল পাগড়ীওয়ালা কনষ্টেবল্ দেখে বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ আত্মশক্তির প্রচারকেরা স্বদেশী সভা থেকে প্রস্থান কর্‌ছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, ব্যঙ্গ-চিত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিদ্রূপাত্মক ছড়াও ছাপা হয়েছিল,

'আত্মশক্তির পরিণাম !
আপনি বাঁচলে বাপের নাম—
চম্পটে চটপটে হয়
পগার পারে চল্লে।
ঐ গো ডিডি, ধল্লে।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের এই আচরণে মডারেটদের সঙ্গে নব্য জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক সম্পর্ক মলিন হয়। কিন্তু আসল কারণ অন্যত্র। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়দলের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান ছিল, তা বরিশাল যজ্ঞভঙ্গের পর ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আবেদন ও আপোষের দ্বারা যে জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয় সে-ধারণা বরিশাল ঘটনার পর বহুলোকের মনে দৃঢ়তর হলো। কংগ্রেসের পুরাতন নীতি যে কত ভ্রান্ত, তা এখন স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। আত্মশক্তির অবলম্বন নীতি হিসাবে যে অবশ্য গ্রহণীয়, বরিশাল ব্যাপারের পর মডারেট দলেরও অনেকে তা হৃদয়ঙ্গম করেন। ২১শে এপ্রিল, ১৯০৬ সনে উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রে মডারেটদের সম্বন্ধে আশা পোষণ করে মন্তব্য করলেন যে,

সরকারী লাঠির আঘাতে তাঁরা তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়েছেন, তাঁদের জ্ঞানচক্ষু এবার উন্মীলিত হয়েছে ও তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তাঁরা আর ফিরিঙ্গির দ্বারস্থ হবেন না * (১১৫)। কিন্তু মডারেটদের আচরণে উপাধ্যায়ের সে-আশা শীঘ্রই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। তিনি দেখতে পেলেন সরকারের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করার পরও মডারেটগণ ফিরিঙ্গি চরিত্রের স্বাভাবিক ঔদার্য ও ন্যায়ধর্মের প্রতি অন্ধের মত অনুরক্ত। ইংরেজের প্রতি মডারেটদের এই অভ্যাসগত অবিচলিত বিশ্বাসকে উপাধ্যায় নিয়মিতভাবে 'সন্ধ্যা' পত্রে আঘাত করতে লাগলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রে নব্য জাতীয়তাবাদী দলের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ ধ্বনিত হতে লাগলো। উপাধ্যায় অরবিন্দ ঘোষ বা বিপিন পালের ন্যায় নতুন রাষ্ট্রদর্শন ব্যাপকভাবে জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে না পারলেও, 'বন্দেমাতরম্' পত্র স্থাপিত হবার পূর্ব পর্যন্ত (৬ই আগষ্ট, ১৯০৬) 'সন্ধ্যা'ই ছিল নব্য জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান প্রচার-বাহন। দুর্ভাগ্যবশত, সরকারী নিষ্পেষণ নীতির ফলে ও কালস্রোতে এই মূল্যবান পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষের কাছে এই পত্রের দু'চারটি সংখ্যা এখনও মজুত রয়েছে বলে শুনতে পাই। কিন্তু উপাধ্যায় সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহের আশায় সেই ব্যক্তি-বিশেষদের নিকট বহুবার যাতায়াত করেও 'সন্ধ্যা'র কোন মূল সংখ্যার সন্ধান আজও আমরা পাই নি বা 'সন্ধ্যা' থেকে তাঁদের সংগৃহীত মালমশলা ব্যবহারের সুযোগ এখনও আমাদের ভাগ্যে জোটে নি।

* (১১৫) *Confidential Report on Native Papers in Bengal*, No. 17 of 1906.

উপাধ্যায়ের একটি মিজম্

তৎকালে 'সন্ধ্যা' ও অন্যান্য দেশীয় পত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করে সপ্তাহে সপ্তাহে সরকারের নিকট রিপোর্ট পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ ইংরেজি অনুবাদ থেকেও 'সন্ধ্যা'র রাষ্ট্রিক ঝাঁজ্ এখনও উপভোগ্য। ১৫ই মে, ১৯০৬ সনে 'সন্ধ্যা' পত্রে উপাধ্যায় লিখলেন :

> "Our leaders have eaten the feringhi's *laddu* and have been quite charmed with its taste. They are licking the *laddu* and felt tempted to have a bite at it. They pressed their teeth into it, but found it full of gravel and sand and tasting extremely bitter. Their fit of intoxication was off. They did not know before that under the equality and liberty of the *feringhis* lay hidden the thrusts of the Gurkhas and the lathis of the police. They were at last coming a little to their senses. But the *feringhis* are a shrewd people. They added a little more sweetness to their *laddu* and hid its bitterness and made it look handsome. That is enough to captivate our Babus, who have again taking to licking the *laddu* and laughing with intoxication "

অর্থাৎ ফিরিঙ্গির দেওয়া লাড্ডু খেয়ে আমাদের নেতারা ওর স্বাদে মোহিত হয়ে গেছে। তারা ঐ লাড্ডু চাট্‌ছে এবং প্রলুব্ধ হয়ে ওতে তারা কামড় পর্যন্ত দিয়েছিল। কামড় দিতেই বুঝতে পারলো যে, ওর ভেতর রয়েছে কাঁকর ও বালি, ওর স্বাদও বিশ্রীরকমের তেতো। তাদের মোহ কেটে গেলো। তারা এতদিন জানতো না যে, ফিরিঙ্গির সাম্য ও স্বাধীনতার পশ্চাতে গুর্খা সৈন্যের দলন ও পুলিশী লাঠিও প্রচ্ছন্ন। অবশেষে তাদের কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু ফিরিঙ্গি বড় ধূর্ত

জাতি। তারা লাড্ডুর গায়ে আরও মিষ্টি মাখিয়ে দিল, ওর ভিতরকার তেতো স্বাদকে লুকিয়ে রেখে লাড্ডুকে মনোহর করে তুলে ধরলো। আমাদের বাবুদের মোহিত করতে তাই যথেষ্ট। বাবুরা আবার লাড্ডু চাট্‌তে আরম্ভ করেছে ও নেশার ঝোঁকে অট্টহাসি হাস্‌ছে * (১১৬)।

উক্ত রচনাটির সবটুকুই এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক সুরে লিখিত। ঐ প্রবন্ধে উপাধ্যায় আরও লিখলেন যে, মোহগ্রস্ত বাঙালী বাবুরা মর্লির শাসনকে উন্নত ও উদার বলে জ্ঞান করে থাকে। তারা মনে করে, মর্লিই পূর্ববঙ্গে স্যার ব্যাম্প্‌ফাইল্ড্‌ ফুলারের স্বৈরাচারকে বন্ধ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এতদিনে ইংরেজ জাতির ঔদাসীন্য দূরীভূত হয়েছে। তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফুলার কর্তৃক 'বন্দেমাতরম্‌ সার্কুলার' প্রত্যাহার, ভারতীয় সংসদে বাজেট আলোচনার জন্য সময়বৃদ্ধির অনুকূলে মর্লির প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করে থাকে। তারা এখনও বিশ্বাস করে যে, স্বাধীনতার আশীর্বাদ ইংরেজ আমাদের হাতে উপহার স্বরূপ দান করবে। পরিশেষে উপাধ্যায় বাঙালী জাতির উদ্দেশে সতর্কবাণী এই বলে উচ্চারণ করেন যে, তোমরা ফিরিঙ্গির মনোহর লাড্ডু দেখে ভুল করো না, ফিরিঙ্গির দেওয়া কোন দানকে কোন মূল্য দিয়ো না। ফিরিঙ্গির লাড্ডুই আমাদের অধঃপতনের কারণ। ফিরিঙ্গির দেওয়া লাড্ডু দেখতে চক্‌চকে হলেও আসলে তা বিষ। সেই চক্‌চকে বিষ তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রে ফিরিঙ্গি চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

* (১১৬) *Confidential Report on Native Papers in Bengal*, No. 20 of 1906

করেই ক্ষান্ত হন নি। দেশবাসীর চোখের সামনে নব্য রাজনীতিক দলের আদর্শও তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সনে 'সন্ধ্যা' পত্রে উপাধ্যায় লিখলেন :

> "We say that we shall create a new independent system, which will regulate our education, the protection of our lives and properties, our trade and commerce, our agriculture, our laws and our courts, our rents and all our dealings. We do not wish to remain for ever under the restraints of foreign domination.······We know that complete independence is impossible for the present. But nonetheless that is the goal which should always be before our eyes."

অর্থাৎ আমরা এক নতুন স্বরাজশীল ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই যা আমাদের শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করবে, যা আমাদের ধনপ্রাণ, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের কৃষিকার্য, আমাদের আইন-কানুন ও অন্যান্য সবকিছু রক্ষা করবে। আমরা চিরদিন বিদেশী শাসনাধীনে থাকতে চাই না।···আমরা জানি বর্তমানে পূর্ণ স্বরাজ লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু সেই লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেন সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকে * (১১৭)।

কলিকাতায় শিবাজী-উৎসব

স্বদেশী যুগের উপাধ্যায় 'সন্ধ্যার' উপাধ্যায় হিসেবেই সমধিক পরিচিত। কারণ 'সন্ধ্যা' পত্রের নির্ভীক পরিচালনাই তখন তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি। তখন 'সন্ধ্যা'ই ছিল তাঁর বাণী-প্রচারের মুখ্য বাহন। কিন্তু 'সন্ধ্যা' পত্র পরিচালনা ছাড়াও তিনি অন্যান্য

* (১১৭) *Confidential Report on Native Papers in Bengal*, No. 40 of 1906.

ভাবে জাতীয় আন্দোলনকে রসসিক্ত ও ঐশ্বর্যময় করেছিলেন। তৎকালের প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ কর্ম ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬ সনের জুন মাসে কলিকাতায় শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে যে স্বদেশী শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতেও উপাধ্যায় এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাদের বলেন, ঐ শিল্প মেলা সংগঠনে ও পরিচালনায় উপাধ্যায় ছিলেন প্রাণস্বরূপ। শিবাজী উৎসব ও আনুষঙ্গিক স্বদেশী মেলা কলিকাতার পান্তির মাঠে পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (৪ঠা জুন থেকে ৮ই জুন, ১৯০৬) * (১১৮)। বাংলার বাইরে থেকে এই উৎসবে যোগদান করতে তিলক, খপর্দে, মুঞ্জে প্রমুখ নেতা কলিকাতায় এসেছিলেন। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারী চণ্ডনীতির দ্বারা আহত, ক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠন করা। তিলক প্রকাশ্য সভায় এই উৎসবকে রাজনৈতিক উৎসব ('political festival') বলে বিশেষিত করলেন * (১১৯)।

১৯০৬ সনের জুলাই মাসে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গৃহে স্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটি গঠন ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কমিটির যে ধারাবাহিক সভা হয়, সেখানে মডারেট দলের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের বিরোধ উপস্থিত হলো। মডারেট দলের নেতা ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং জাতীয়তাবাদী বা একষ্ট্রিমিষ্ট দলের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ নেতা। দুই দলের শক্তি পরীক্ষায়

* (১১৮) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮

* (১১৯) বর্তমান লেখকদের *India's Fight For Freedom* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭১) শিবাজী উৎসব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত আছে।

উপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী দলের সপক্ষে উক্ত সভায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন * (১২০)।

'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রতিষ্ঠা

এর পরবর্তী ঘটনা জাতীয়তাবাদী দলের সর্বভারতীয় দৈনিক মুখপত্র হিসেবে আগষ্ট মাসে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা। উপাধ্যায় এ বিষয়েও অগ্রণী হলেন। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "উপাধ্যায় ১লা আগষ্ট হইতেই জাতীয় দলের ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১লা 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু ৭ই আগষ্টের পূর্বেই তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল"* (১২১)। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের উৎসাহ ও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বস্তুত, 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বহুলাংশে তাঁরই মানস সন্তান * (১২২)। জন্মের পর এই মানস সন্তান যাঁদের সস্নেহ যত্ন ও সেবার দ্বারা প্রথম দিকে লালিত পালিত হয়েছিল, উপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন। প্রথম দিকে 'বন্দে মাতরম্' পত্র মুদ্রণের দায়িত্বও মূলত উপাধ্যায়কেই গ্রহণ করতে হয়। যে 'বন্দে মাতরম্' পত্র ১৯০৭ সনে অরবিন্দ ঘোষের সুযোগ্য পরিচালনায়

* (১২০) "কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৫

* (১২১) "কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ১৭৩

* (১২২) বর্তমান লেখকদের *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬) দ্রষ্টব্য। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁর "কংগ্রেস" বইয়ে (পৃষ্ঠা ১৭৩) যে বিবরণ দিয়েছেন, তা বর্তমান লেখকদ্বয় সর্বাংশে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, হেমেন্দ্রবাবু তাঁর *Aurobindo—The Prophet of Patriotism* গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১১-১২) এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা' অনেক বেশি স্বীকার্য।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নবযুগের উদ্বোধন করেছিল, যার সম্পাদকীয় রচনা এদেশের ও বিলাতের শিক্ষিত সমাজকে একদা স্তম্ভিত করে দেয়, সেই যুগান্তকারী পত্রিকার জন্ম-ইতিহাসে উপাধ্যায়ের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯০৬ সনের কলিকাতা কংগ্রেস

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নব্য জাতীয়তাবাদী দলের একান্ত ইচ্ছা ছিল মহা-রাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলককে সভাপতি পদে বরণ করা, কিন্তু মডারেটগণের বিরোধিতায় তাঁদের সে প্রস্তাব কার্যকরী হলো না। বিলাতে অবস্থিত দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেস সভাপতি পদে আমন্ত্রণ জানিয়ে মডারেটগণ পত্র লিখলেন। মডারেটদের ইচ্ছা জয়যুক্ত হলো। কিন্তু কংগ্রেস মঞ্চ থেকে নৌরজী "স্বরাজের" মন্ত্র প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করলে মডারেটদল সন্তুষ্ট হতে পারে নি। একষ্ট্রিমিষ্ট দলের চাপে শেষ পর্যন্ত বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবও গৃহীত হলো। স্বরাজের প্রসঙ্গে প্রস্তাবে ঘোষিত হলো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য। মোটের উপর কলিকাতা অধিবেশনের কার্য ও প্রস্তাবাদি মডারেট-দের মনঃপূত হলো না। বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেলেন জাতীয়তাবাদী দলের বর্দ্ধিষ্ণু শক্তি ও বিজয় গৌরব। তাই তাঁরা উপায় সন্ধান করতে লাগলেন পরবর্তী কংগ্রেসে কিভাবে ঐ বিপ্লবাত্মক প্রস্তাবগুলিকে বাতিল করা যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল "নৌরজী" উচ্চারিত "স্বরাজ" পারিভাষিকে একটা ব্যাপক ও বিপ্লবাত্মক অর্থ প্রদান করে নতুন উদ্দীপনায় ঐ নব আদর্শ প্রচারে ব্রতবদ্ধ হন। ১৯০৭

সনে 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা এই প্রচার কার্য খুব জোরের সঙ্গে চালাতে থাকে। মডারেটদের সঙ্গে আদর্শ ও নীতি নিয়ে একষ্ট্রিমিষ্টদের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (২৯-৩১শে মার্চ, ১৯০৭) দুই-দলের এই বিরোধকে স্পষ্টতর করে তোলে * (১২৩)। তৎকালে মডারেট দলের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' নৈতিক অধঃপতনকে নিন্দা করে 'বন্দে মাতরমে' ইতিপূর্বেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল * (১২৪)। বহরমপুর কনফারেন্সের পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' জাতীয়তাবাদী দলের উদ্দেশে তীব্র ভাষায় গালি বর্ষণ করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১০ই এপ্রিল, ১৯০৭ সনে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা "The New Thought" শীর্ষক প্রবন্ধে তার পাল্টা জবাব দিল। ঐ প্রসঙ্গেই অরবিন্দ জাতীয়তাবাদী দলের উদ্দেশ্য ও কর্মনীতিকে "The New Thought: The Doctrine of Passive Resistance" নামক ৭টি ধারাবাহিক প্রবন্ধে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে ভারতীয় রাজনীতিতে এক অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করলেন * (১২৫)।

* (১২৩) বহরমপুর সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ "The Bengal Provincial Conference" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে "বন্দে মাতরম্" পত্র (২রা এপ্রিল—৫ই এপ্রিল, ১৯০৭ সনে) প্রকাশ করে।

* (১২৪) "বন্দে মাতরম্" পত্রে "From What Heighth Fallen" শীর্ষক প্রবন্ধ (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

* (১২৫) "The Doctrine of Passive Resistance" নামক প্রবন্ধ সাতটি যথাক্রমে ১১ই, ১২ই, ১৩ই, ১৭ই, ১৮ই-১৯শে, ২০শে ও ২৩শে এপ্রিল "বন্দে মাতরম্" পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলি ১৯৪৮ সনে কলিকাতাস্থ "আর্য পাবলিশিং হাউস" থেকে "The Doctrine of Passive Resistance" নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশক তাঁর বিবৃতিতে লিখেছেন যে, ঐ প্রবন্ধগুলি ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৭ সনের মধ্যে "বন্দে মাতরম্" পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তথ্য সঠিক নয়। ঐ প্রবন্ধগুলি

উপাধ্যায়ের 'স্বরাজ'পত্র

ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন (১০ই মার্চ, ১৯০৭)। 'স্বরাজ' সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র, প্রতি রবিবার প্রকাশিত হতো। ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এর কার্যালয় অবস্থিত ছিল। এই ঠিকানা থেকে তখনও উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' দৈনিক বের হতো। সারদাচরণ সেন ছিলেন উভয়েরই কর্মকর্তা।

প্রতি সংখ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকার মলাটের উপরে 'স্বরাজ' শব্দটি বড় বড় বাংলা হরফে ছাপা থাক্‌তো, কিন্তু ভিতরে প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নাম ছাপা হতো দেবনাগরী লিপিতে আর তার বাঁ দিকে সন্নিবিষ্ট থাক্‌তো শিবাজীর ছবি। পত্রিকাখানি 'ফোলিও' সাইজের ষোল পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল।

'স্বরাজ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি মুদ্রিত হয়; সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি ছবিও। উপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সমন্ধে লিখলেন.

> "যাঁহার 'বন্দে মাতরম্' পাঞ্চজন্য নাদে আজ কন্যাকুমারিকা হইতে গোমুখী ধারা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ মাতিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার সুললতি শব্দবিন্যাসের কলধ্বনি বঙ্গভাষার গদ্য রচনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, যাঁহার নানা আখ্যায়িকার প্রমোদরসোচ্ছ্বাসে রসজ্ঞ বাঙ্গালী বিভোর হইয়া আছে, যিনি বর্তমান যুগে ফেরঙ্গ-সভ্যতা-বিপর্যস্ত বাঙ্গালীসমাজের শিক্ষাদাতা,—প্রথমে সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছি।... তাঁহার আনন্দমঠে 'স্বরাজের' মহামন্ত্র নিহিত আছে— তাই তাঁহার আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জীবনকথার

১১ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে বের হয়েছিল। "বন্দে মাতরম্" পত্রই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

আলোচনা করিয়া তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' গীত গাহিয়া আমরা স্বরাজের মঙ্গলাচরণ করিলাম"।

স্পষ্টত বুঝা গেলো উপাধ্যায়ের স্বরাজ-সাধনা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ। স্বদেশী যুগের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বঙ্কিমী প্রভাবের আর এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক কালের বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক সাধনার দীক্ষাগুরু। 'বন্দে মাতরম্' পত্রে ১৯০৭ সনে অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' নামে অভিহিত করে বলেছিলেন, যে-নব চিন্তাধারা জাতিকে জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বঙ্কিম তার প্রাণ ও প্রেরণা, বঙ্কিম তার রাষ্ট্রিক দীক্ষাগুরু * (১২৬)।

উপাধ্যায়ের রাষ্ট্রিক চিন্তার পরিণত অভিব্যক্তি 'স্বরাজ' পত্রিকায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি ভারতের জন্য যে স্বরাজাদর্শের স্বপ্ন দেখেন, তা' শুধু ইংরেজ শৃঙ্খল থেকে ভারতের রাষ্ট্রিক বন্ধনচ্ছেদ নয়, লক্ষ্য আরও মহৎ, আরও বিরাট। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ভারতের জন্য প্রয়োজন, কারণ ঐ স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে ও মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। উপাধ্যায় ভারতীয় সমাজ আর হিন্দু সমাজ একার্থক বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই ভারতীয় সমাজের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অর্থ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল হিন্দু সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা। মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি অবজ্ঞা না করলেও হিন্দুসমাজের জয়ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল, কারণ ভারতীয় জনসমষ্টির হিন্দুই হলো বৃহত্তম অংশ।

* (১২৬) "Of the new spirit that is leading the nation to resurgence and independence Bankim is the inspirer and political guru." অরবিন্দের এই উক্তি "বন্দে মাতরম্" পত্রে প্রকাশিত (১৬ই এপ্রিল, ১৯০৭, পৃষ্ঠা ৪) "Rishi Bunkimchandra" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরাধীনতার বন্ধন-বেদনা তীব্রভাবে অনুভূত না হলে স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না। 'দাসত্বের হৃষ্টপুষ্টতা'র—যাকে অরবিন্দ বলতেন 'prosperous serfdom' তার—দিকে লোভ থাকলে জাতীয় মুক্তি অসম্ভব। উপাধ্যায় "নেকেড়ে বাঘ ও পালিত কুকুর" প্রবন্ধে ক্ষুব্ধভাবে মন্তব্য করেন যে, অনাহারে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার স্বাধীন নেকেড়ে বাঘও বুঝে যে পরাধীনতার আরাম অপেক্ষা স্বাধীনতার বেদনা শ্রেয়। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা তাও উপলব্ধি করে না। তাদের দৃষ্টি সর্বদাই পালিত কুকুরের হৃষ্টপুষ্টতার দিকে—গলায় গলাবন্ধের ব্যথা তারা অনুভব করে না। উপাধ্যায় লিখলেন,

> "যদি আজ ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করিতেন—পৃথিবীতে আশ্চর্য কি—তাহা হইলে এই উত্তরই স্বষ্ঠু হইত—পরাধীন ভারতবাসী পরাধীনতার দুঃখ ও হীনতা বুঝে না" * (১২৯)।

যে জাতি অসাড়, সংজ্ঞাহীন, আঘাত না খেলে তার চৈতন্যোদয় হয় না। "মার না খাইলে অসাড়ের সাড় হয় না।···মার না পড়িলে মোহ ভাঙ্গিবে না—সাড় হইবে না—মর্যাদাবোধ জাগিবে না। মার ত পড়িতেছে। বরিশালের গুর্খা—বানরিপাড়ার পিটুনি পুলিশ—সিরাজগঞ্জের আসামী লাঠি—কুমিল্লার হল্লা—এসব মার নয় ত আর কি। কিন্তু ইহাতেও শানায় নাই। আরও মার পড়ুক। তোমরা শান্তি শান্তি করিয়া ব্যস্ত হইও না" * (১৩০)। দুঃখের মধ্য দিয়ে হয় কল্যাণের জন্ম—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসে নবজীবন। তাই বিদেশী শাসকের অত্যাচারে

* (১২৯) 'স্বরাজ' পত্রে (৩রা চৈত্র, ১৩১৩ বা ১৭ই মার্চ, ১৯০৭) "নেকেড়ে বাঘ ও পালিত কুকুর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (১৩০) উক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উপাধ্যায় ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে কঠোরতর অত্যাচারকে আমন্ত্রণ করলেন এই বিশ্বাসে যে, শাসকের অত্যাচার যত প্রবল হবে ততই জাতির জ্ঞানচক্ষু হবে উন্মীলিত ও স্বরাজ-স্থাপনের পথ হবে প্রশস্ত।

ব্রিটিশ শাসননীতির সঙ্গে ভারতের স্বরাজনীতির স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত বিরোধ সম্বন্ধে যতদিন ভারতবাসীর স্পষ্ট ধারণা না থাকবে, ততদিন উপাধ্যায়ের মতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক অগ্রগতি অব্যাহত হতে পারে না। উনিশ শতকের রাষ্ট্রনায়কেরা, এমন কি বিংশ শতকের সূচনায় কংগ্রেসী মডারেট রাজনীতিকগণও, এই বাস্তব তথ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। তাই ইংরেজ শাসকের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার বদলে তাঁরা অবিশ্রান্ত-ভাবে আবেদন জানিয়েছেন ইংরেজ জাতির স্বাভাবিক ঔদার্য ও মানবিকতার নিকট। তাঁদের সে আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। নতুন যুগে নতুন রাষ্ট্রদর্শন প্রয়োজন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় সেই রাষ্ট্রদর্শনের প্রথম কথা হলো, "যতদিন ভারত ব্রিটিশের থাকিবে ততদিন স্বরাজলাভ অসম্ভব, যখন স্বরাজলাভ হইবে তখন ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সহিত বর্তমান প্রভুত্বের সম্বন্ধ কোনো প্রকারেই থাকিবে না" * (১৩১)। বিপিনচন্দ্রের মত উপাধ্যায়ও শুধু স্বরাজের আদর্শই জাতির সামনে ঘোষণা করে ক্ষান্ত থাকলেন না, তাঁরা স্বরাজলাভের জন্য সংগ্রামের পথও অনুমোদন করলেন। তাঁদের মতে,

> "ইদংএর সংঘর্ষেই অহং জাগ্রত হয়; ইদং যদি না থাকিত, অহং আপনাকেও চিনিত না, ইদংকেও জানিতে পারিত না। অপরের

* (১৩১) 'স্বরাজ' পত্রে (২৪শে চৈত্র, ১৩১৩) "ব্রিটিশনীতি ও স্বরাজনীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও সারদা চরণ সেন বলেন যে এই প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্র পালের রচনা।

অস্তিত্বের সম্মুখীন হইয়াই আমরা নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, অপরের ব্যক্তিত্ব যখন আমাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়ায় তখনই আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বকে চিনি। অপরের শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই আমরা নিজের শক্তি কত তাহা বুঝি। সেইরূপ পর রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের স্বরাজের ভাবও জাগিয়া উঠে।

"বহুকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়াও ভারতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে ঠিক পর রাষ্ট্র বলিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্রিটিশেরা আমাদের স্বজাতীয় নহে, এ জ্ঞান চিরদিনই ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুশক্তি যে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এ জ্ঞান বহু কাল জন্মে নাই।…পর রাষ্ট্রাধীনতার বেদনা যতক্ষণ না অনুভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। যেমন অহংতত্ত্বে আত্মানাত্মবিবেক হইতে অহংজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের সূচনা হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রতত্ত্বে স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্র-ভেদ বিচার হইতে স্বরাজ জ্ঞানের সঞ্চার হয়।…সেইরূপ পর রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে যে বিভেদ আছে, তাহার সম্যক জ্ঞানের উপরেই স্বরাজ ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।…ফিরিঙ্গির সঙ্গে সর্বপ্রকার সুখকর সম্বন্ধ বর্জন করিতে চেষ্টা করা স্বরাজ-সাধনের প্রথম সোপান" * (১৩২)।

ইংরেজ শাসনের প্রকৃতিগত ঔদার্যে ও মানবিকতার আদর্শে উপাধ্যায় একদা গভীর আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রিক পরিবেশে তাঁর সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেলো। তাই তিনি আত্মশক্তির দ্বারা আত্মোন্নতির ও আত্মরক্ষার নীতিই বার বার উচ্চারণ করলেন। ১৯০৭ সনের মার্চ মাসের মধ্যভাগে কুমিল্লায় দাঙ্গা বাধে। নবাব সালিমুল্লার প্ররোচনা ও ইংরেজ সরকারের মৌন সমর্থন বা নিষ্ক্রিয়তা এই শোচনীয় পরিস্থিতিকে সম্ভব করে তোলে। তিন

* (১৩২) 'স্বরাজ' পত্রে (১০ই চৈত্র, ১৩১৩) বিপিন পালের 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দিন ধরে হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা চলে, শেষে হিন্দুর গুলিতে জনৈক মুসলমানের মৃত্যু হয়। আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ শাসকের শরণাপন্ন হওয়া কতদূর ভ্রান্ত, এবার তা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো। জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করতে দেশবাসীকে পরামর্শ দিলেন। ঐ বৎসরের মার্চ মাসের শেষ দিকে বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনে উভয় বঙ্গের প্রতিনিধিগণ মিলিত হবেন। গুণ্ডারাজের সূচনা, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দুর উপর অমানুষিক অত্যাচার এই রাষ্ট্রিক পটভূমিতে উপাধ্যায় বহরমপুর সম্মেলনের বিবেচনার্থে আত্মরক্ষার একটি পন্থা নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, "এবার স্বদেশী থানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা চাই" * (১৩৩)।

স্বদেশী যুগে 'বয়কট' নীতি ছিল নিরস্ত্র জাতির সংগ্রামী হাতিয়ার। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যকার রাজনৈতিক সংগ্রাম সুরু হবার পূর্বে 'বয়কট' নীতি বাংলা দেশে প্রায় সার্বজনিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হলে কোনো কোনো ব্যক্তি 'বয়কটের' ভয়াবহ শক্তি লক্ষ্য করে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, এ-জাতীয় স্বদেশনিষ্ঠা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী, অতএব নিন্দনীয়। ১৯০৭ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি ছিলেন। তখন তিনি 'বয়কট'কে আর সমর্থন করতে পারলেন না এই বলে যে, এর সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ, যা মানব ধর্মের বিরোধী। অরবিন্দ 'বয়কট'কে ঘৃণাসঞ্জাত বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে 'বয়কট' ছিল নিরস্ত্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বশেষ

* (১৩৩) 'স্বরাজ' পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় "বহরমপুরের বৈঠক ও আত্মরক্ষা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অমোঘ অস্ত্র * (১৩৪)। উপাধ্যায়ও ঐ একই ভাবের ভাবুক। তিনিও 'স্বরাজ' পত্রে মন্তব্য করলেন,

> "একদল লোক বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আঘাত পড়ে বলিয়া স্বরাজ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন।···ইঁহারা স্বদেশকে ভালবাসিতে চান, আন্তরিক ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু এই স্বজাতি-বাৎসল্য হইতে যখন আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে তখন এই প্রতিষ্ঠার ভিতরে দণ্ডকলহাদির সম্ভাবনা দেখিয়া ইঁহারা আপনার স্বদেশভক্তিকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন। ইঁহারা স্বরাজ চাহেন, কিন্তু এমনভাবে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে যাহাতে অন্য কাহারও স্বার্থের উপরে কোনো আঘাত না পড়ে। ইঁহারা বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারা অভিভূত রহিয়াছেন। আপনার জাতীয় উন্নতির সঙ্গে অপর কাহারো জাতীয় উন্নতির কোনো প্রকারের স্বাভাবিক বিরোধ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতেই সত্য। পরাধীনতার অবস্থা সহজ অবস্থা নহে, পরাধীনতার অবস্থা শান্তির অবস্থা নহে। উহা সংগ্রামের অবস্থা।··· সহজ অবস্থার ব্যবস্থা ও ধর্ম অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য প্রামাণ হয় না।" * (১৩৫)।

তাই ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে উপাধ্যায় স্বরাজলাভের উপায় হিসাবে পররাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উপাধ্যায়ের রাষ্ট্রচিন্তায় সংগ্রামের স্থান অতি উচ্চে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্বাভাবিক অবস্থায় যতই বরণীয় হোক্ না কেন, বৃটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য তিনি সে আদর্শ তুলে ধরেন নি, বরং তৎকালীন বিশেষ রাষ্ট্রিক পরিস্থিতেতে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কারণ তাঁর সুদৃঢ় ধারণা ছিল এই যে,

* (১৩৪) ৩০শে জুলাই ১৯০৭ সনের 'বন্দে মাতরম্' পত্রে প্রকাশিত" How The Boycott Succeeded" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (১৩৫) 'স্বরাজ' পত্রে প্রকাশিত (১৫ই বৈশাখ, ১৩১৪) "স্বদেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পররাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হলে ভারতবাসীর স্বরাষ্ট্র জ্ঞান স্পষ্ট হবে না। 'স্বরাজ' পত্রে তিনি যে আদর্শ প্রচার করলেন, 'সন্ধ্যা' পত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘট্‌লো না। দেশের জনসাধারণের কাছে তাদের বোধগম্য ভাষায় স্বরাজাদর্শ প্রচারে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মত প্রভাবশীল বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র সেকালে এদেশে আর ছিল না। ভারতবাসীর স্বরাজ-সাধনার ইতিহাসে উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্র এক অতুলনীয় কীর্তি। 'স্বরাজ' পত্রিকার ভাষা অপেক্ষা 'সন্ধ্যা'র ভাষা ছিল আরও কঠোর, ফিরিঙ্গি সরকারের উপর শ্লেষ ছিল আরও তীব্র। উভয় পত্রিকাই জাতীয়তাবাদী দলের রাষ্ট্রিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে। 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'বন্দে মাতরম্' পত্র ১৯০৭ সনের পূর্ব থেকেই জাতীয়তাবাদী দলের প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিল। ১৯০৭ সনের মে মাসে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা কর্তৃক 'নবশক্তি' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ পত্রিকাও নব রাজনীতিক আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করে।

'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা

অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক প্রচার কার্য এদেশে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যে মডারেট দল ও ভারতসচিব মর্লি উভয়েই চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। মডারেটগণকে হাত করবার উদ্দেশ্যে শাসন-সংস্কারের মেকী প্রস্তাবও সাড়ম্বরে ঘোষিত হলো আর সেই সঙ্গে গৃহীত হলো নির্মম নিষ্পেষণ নীতি। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে একে একে আইনের আবরণে আক্রমণ করা হলো। বাংলা দেশে সকলের প্রথমেই সরকারী কোপ পড়লো 'যুগান্তরে'র উপর।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হলেন এবং স্বেচ্ছায় 'যুগান্তরের' সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে হাসিমুখে কারাবরণ করলেন (জুলাই, ১৯০৭) * (১৩৬)। পরবর্তী কোপ পড়লো 'বন্দে মাতরমে'র উপর। অরবিন্দ ও আরও অনেকে ধৃত হলেন, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' সিডিশান মামলা বিচারের নামে চরম প্রহসনে পরিণত হলো। অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজদ্রোহের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলো না। অরবিন্দ খালাস পেলেন। শুধু মুদ্রাকরের শাস্তি হলো তিন মাসের কারাদণ্ড * (১৩৭)।

ঠিক এর পরই সরকারের পক্ষ থেকে আক্রমণ এলো 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উপর। ৩০শে আগষ্ট, ১৯০৭ সনে পুলিশ 'সন্ধ্যা' আফিসে খানাতল্লাস চালায়। পত্রিকার ম্যানেজার ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত না থাকায় পুলিশ ম্যানেজার সারদা-চরণ সেনকে শমন দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে। তা'ছাড়া, আরও দুই ব্যক্তির—সম্পাদক উপাধ্যায় ও মুদ্রাকর হরিচরণ দাসের—বিরুদ্ধে দু'খানা শমন পুলিশের সঙ্গে থাক্‌লো। ম্যানেজার অবিলম্বে জামিনে খালাস পেলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা পুলিশ কোর্টে বিচারের দিন ধার্য হলো * (১৩৮)। ১৯০৭ সনের ৯ই জুলাই ও ১০ই আগষ্ট 'সন্ধ্যা' পত্রে দু'টি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগ সারদাচরণের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয়।

* (১৩৬) বর্তমান লেখকদের "স্বদেশী যুগে সংবাদ পত্র দলনের কাহিনী" ('মন্দিরা', মে-জুলাই, ১৯৫৭) এবং "The Jugantar Prosecutions" (*Hindusthan Standard*: Puja Annual, 1959) প্রবন্ধদ্বয় বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য।

(১৩৭) বর্তমান লেখকদের "The Story of Bande Mataram Sedition Trial" (*Modern Review* for October, 1959 দ্রষ্টব্য।

* (১৩৮) "Sandhya Manager Arrested" শিরোনামায় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনের *Bengalee* পত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্রষ্টব্য।

বাজারে গুজব রট্‌লো যে, ঐ একই অভিযোগে পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর শীঘ্রই গ্রেপ্তার হবেন * (১৩৯ ।

উপাধ্যায় যখন শুনলেন যে, তাঁর নামে ও মুদ্রাকরের নামে আরও দু'খানা শমন বের হয়েছে, তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলেন না। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে তিনি নিজেই পুলিশকে 'সন্ধ্যা' আফিসে আহ্বান করে আনার জন্য সারদাচরণকে জোড়াসাঁকো থানায় পাঠালেন। ঐ খবর পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই থানা থেকে দুইজন ইন্‌স্‌পেকটার মাত্র একজন কনষ্টেবল্‌কে সঙ্গে নিয়ে ২৩নং শিবনারায়ণ দাস লেনে 'সন্ধ্যা' আফিসে এসে হাজির হন এবং উপাধ্যায় ও হরিচরণকে গ্রেপ্তার করে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা উভয়েই জামিনে খালাস পেলেন। বিখ্যাত কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন এবং 'ভারত-লক্ষ্মী ভাণ্ডারে'র শরৎচন্দ্র সিংহ তাঁদের উভয়ের জন্যই স্বতন্ত্র-ভাবে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে দাঁড়ান। ৯ই সেপ্টেম্বর শুনানীর দিন ধার্য হলো * (১৪০)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৯ই সেপ্টেম্বর বা ১১ই সেপ্টেম্বরও বিচারের কাজ তেমন কিছু অগ্রসর হলো না। কলিকাতা পুলিশ কোর্টে তখন 'বন্দে মাতরম্‌' সিডিশন মামলা পুরাদমে চলেছে। ২৩শে সেপ্টেম্বর এই মামলার নিষ্পত্তি হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের প্রধান

* (১৩৯) উক্ত পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

* (১৪০) "বন্দেমাতরম্‌" পত্রিকায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে "More Arrests for Sedition—Srijut Brahmabandhab Surrenders—Sandhya's Printer Arrested" শীর্ষক সংবাদ দ্রষ্টব্য। ঐ প্রসঙ্গে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনের "অমৃত-বাজার পত্রিকা"ও পঠিতব্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড 'বন্দে মাতরম্' মামলায় বিচারের রা
দেবার অব্যবহিত পরেই 'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা বিচারের জ
গ্রহণ করেন। 'সন্ধ্যার' এই মামলায় তিন ব্যক্তি—যথাক্রমে
সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ম্যানেজার সারদাচরণ সেন
মুদ্রাকর হরিচরণ দাস—ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে
অভিযুক্ত হলেন, আর তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো 'সন্ধ্যা' পত্রে
১৩ই, ২০শে ও ২৩শে আগষ্ট তিনটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ প্রকাশ।
প্রবন্ধ তিনটির নাম যথাক্রমে ছিল "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের
দায়ে", "ছিদিশনের হুড়ুম্ হুড়ুম্ ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম্"
এবং "বাচ্চা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন"। সম্পাদকের
পক্ষে কৌঁস্থলী হলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। ম্যানেজার ও
মুদ্রাকরের পক্ষে উকিল দাঁড়ালেন শ্রীযুক্ত জে. এন্. রায় ও
এ. কে. ঘোষ।

উপাধ্যায়ের স্মরণীয় বিবৃতি

সরকারী পক্ষের কৌঁস্থলী মিঃ হিউম মামলার কাজ আরম্ভ
করবার পূর্বেই প্রথম আসামী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ম্যাজিষ্ট্রেটের
নিকট এক লিখিত বিবৃতি পেশ করেন (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)।
ঐ বিবৃতিতে উপাধ্যায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে.

> "I accept the entire responsibility of the publication management and conduct of the newspaper Sandhya and I say I am the writer of the article, Ekhan Theke Gechi Premer Dai which appeared in the Sandhya of the 13th August 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the

God-appointed mission of Swaraj I am in any way accountable to the alien people, who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development" * (১৪১).

অর্থাৎ 'সন্ধ্যা' পত্র পরিচালনা ও প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি এবং আমি বলছি যে, 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধের—যে প্রবন্ধ ১৩ই আগষ্ট ১৯০৭ সনে সন্ধ্যা পত্রে প্রকাশিত হয় ও যে প্রবন্ধ বর্তমান মামলার অন্যতম বিষয়বস্তু তার—লেখক আমি। কিন্তু এই বিচারে আমি কোনরূপ অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক নই, কারণ বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বরাজ-ব্রত উদ্‌যাপনে আমার কোনো অংশের জন্য আমি বিদেশী জাতির নিকট—যে জাতি বর্তমানে আমাদের শাসক ও যার স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় বিকাশের পথে অন্তরায়স্বরূপ তার নিকট—জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। উপাধ্যায়ের এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও

* (১৪১) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর "ভারতের মুক্তি-সন্ধানী" গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯৫৮) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ২৩৪) যে লিখেছেন,—"১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ তারিখে…ব্রহ্মবান্ধবের বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম দিনই তিনি বিচারকের সম্মুখে এই বিবৃতি পাঠ করিলেন,"—তা সম্পূর্ণ ভুল। 'সন্ধ্যা' মামলার বিচার কার্য প্রকৃত পক্ষে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনেই সুরু হয় আর ঐ দিনই উপাধ্যায় তাঁর স্মরণীয় বিবৃতি দাখিল করেন। এই প্রসঙ্গে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

তা'ছাড়া, উপাধ্যায়ের ঐ বিবৃতি বাগল মহাশয়ের গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩৪) যেভাবে উদ্ধৃত রয়েছে, তাতেও কিছু ভুল লক্ষণীয়। "But I do not take any part" এই স্থলে আসলে হবে "But I do not want to take any part." ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনের 'বন্দে মাতরম্' বা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

অধিকন্তু, বাগল মহাশয় উপাধ্যায় সম্বন্ধে 'বন্দে মাতরম্' পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে যে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ২৩৬) সেখানেও কিছু কিছু মূল ভাষার অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ও গণ্ডগোল নজরে পড়ে।

তেজঃদৃপ্ত ঘোষণা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্নির স্বাক্ষর রেখে গেলো। 'বন্দে মাতরম্' পত্র পরদিন উপাধ্যায়ের এই স্মরণীয় বিবৃতি প্রকাশকালে মন্তব্য করে,

> "Never in the history of seditious trial in India has a statement so bold— so straightforward and so dignified been filed. The statement is in every way worthy of the Editor of Sandhya."

অর্থাৎ ভারতে সিডিশান মামলার ইতিহাসে এমন সাহসিক, এমন স্পষ্ট, ও মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি আর কখনও দাখিল করা হয় নি। বিবৃতিটা সর্বাংশে 'সন্ধ্যা' সম্পাদকেরই উপযুক্ত।

উপাধ্যায়ের বিবৃতি অতি সোজা ও অতি স্পষ্ট ভাষায় রচিত। কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা বা শব্দের মারপ্যাঁচ ছিল না। তবুও সরকারী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ হিউম বল্লেন, তাঁর হাতে এমন সব নজির রয়েছে যা দিয়ে তিনি দেখাতে পারবেন যে, প্রথম আসামী এ পর্যন্ত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদনা করছেন। তারপর তিনি "ম্যালকম্ কেস" (Malcolm case) উল্লেখ করে বলেন ওটাই হলো 'সন্ধ্যা' মামলার ইতিহাসে প্রথম ঘটনা। 'সন্ধ্যা' পত্র ম্যাল্কম সাহেবের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ প্রকাশ করলে ম্যাল্কম সাহেব 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করেন। উপাধ্যায় তখনই অভিযুক্ত হন। কিন্তু যেহেতু আসামী তাঁর পত্রিকায় বিনাসর্তে ত্রুটি স্বীকার করে পাঁচবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, সেই হেতু ম্যাল্কম্ সাহেবও শেষ পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেন। হিউম আরও বলেন যে, এর পরবর্তী ঘটনা সন্ধ্যা পত্রকে সতর্ক করে সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো। ৭ই জুন, ১৯০৭ সনে বাংলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত

এক পত্র সন্ধ্যার সম্পাদককে প্রেরণ করা হয়। ১০ই জুন ঐ পত্রিকার ম্যানেজার সরকারকে এক পত্র লিখে জানতে চান যে 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত কোন কোন রচনা রাজদ্রোহমূলক * (১৪২)। বাংলা সরকারের বিশ্বস্ত কেরাণী (Confidential clerk) ঐ দিনই আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান কালে বলেন যে, 'সন্ধ্যা'র ম্যানেজার লিখিত ঐ পত্রেরও উত্তর সরকারী মহল থেকে পাঠানো হয়েছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর 'সন্ধ্যা' পত্র সম্পর্কে যাঁরা সাক্ষ্য দিতে আদালতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বরিশালের 'স্বদেশ' ও 'বিকাশ' পত্রের সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহ এবং 'বেঙ্গলী' পত্রের সহ-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই 'সন্ধ্যা' পত্রে প্রবন্ধাদি লিখতেন। প্রিয়নাথ গুহ শুধু বলেন যে, উপাধ্যায় তাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ও উপাধ্যায়কে তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক বলেই জানেন। পাঁচকড়িবাবু সাক্ষ্য প্রদান কালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন :

> "Conductors should eschew politics as that is understood now and take to proper and thorough exposition of principle underlying the Hindu social and religious system, thus try to wean away the educated classes from the glamour of the European civilisation."

অর্থাৎ পরিচালক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো রাজনীতি-চর্চা বললে আজকাল যা বুঝায় তার বর্জন এবং হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম ব্যবস্থার পশ্চাতে যে মূলনীতি বর্তমান তার সঠিক ও পরিপূর্ণ

* (১৪২) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে কলিকাতা পুলিশ কোর্টে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রসঙ্গে মিঃ হিউম প্রদত্ত বিবৃতি 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ উদ্ঘাটন। তাঁদের উদ্দেশ্য ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্য থেকে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি স্বদেশের দিকে ফিরিয়ে আনা। পাঁচকড়ি বাবুর উক্তি থেকে আরও জানা যায় যে, ১৯০ সনে বিপিনচন্দ্র পালও 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন* (১৪৩)।

বাংলা সরকারের অনুবাদক নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য 'সন্ধ্যা' মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। তিনিই সপ্তাহে সপ্তাহে 'সন্ধ্যা' পত্রের রচনাগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে তৎকালে সরকারের নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি পূর্বোল্লিখিত ঐ তিনটি প্রবন্ধ ছাড়াও সাক্ষ্যদান কালে আরও অনেকগুলি সন্ধ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নামোল্লেখ করেন, যেমন—"আমাদের পোয়াবারো ফিরিঙ্গির তেরো" (৭ই আগষ্ট, ১৯০৭), "আজ কালীঘাটে জোড়া পাঠা একটা কালো একটা সাদা" (৯ই আগষ্ট, ১৯০৭), "ফিরিঙ্গি পরম দয়ালু, ফিরিঙ্গির কৃপায় দাঁড়ি গজায় শীতকালে খাই শাঁকালু" (২১শে আগষ্ট, ১৯০৭), "ঢেঁকী অবতার" (৩০শে আগষ্ট, ১৯০৭), "গোদা পার ভোঁথা লাথি" (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭), "দুশো মজা তিলাই খাজা" (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) ইত্যাদি * (১৪৪)।

এই ভাবে 'সন্ধ্যা' মামলার কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। ৩০শে সেপ্টেম্বর আদালতের কাজ সুরু হতেই ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন যে, যেহেতু প্রথম আসামী নিজ বিবৃতিতে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিজ

* (১৪৩) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

* (১৪৪) ২৫শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর, ১৯০৭ সনের 'বন্দে মাতরম্' পত্রে প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' মামলার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু আমি প্রথম আসামীর মামলা থেকে সরে যেতে চাই ; তবে আমার বন্ধু মিঃ জে, এন্, রায় এখনও অসুস্থ থাকায় আমি দ্বিতীয় আসামীর পক্ষে দাঁড়াবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ঐ দিন সরকারী অনুবাদক অভিযুক্ত তিনটি রচনা ছাড়াও 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধের একটার পর একটা নামোল্লেখ করতে থাকলে চিত্তরঞ্জন দাস আপত্তি তুলে বলেন যে ঐগুলি বর্তমান মামলার বিষয়বস্তু বহির্ভূত।

এর পর ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড 'সন্ধ্যা'র তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ খাড়া করেন যে, তাঁরা বৃটিশ ভারতে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি জনগণের মনে বিক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম আসামী উপাধ্যায়কে তাঁর বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : "I have said my say. There is nothing more to add." অর্থাৎ আমি যা বলবার বলে দিয়েছি। আমার আর কিছু বলবার নেই। বিচারক এর উত্তরে বলেন : "You refuse to plead guilty or not guilty". অর্থাৎ আপনি দোষী বা নির্দোষ তা বলতে চান না। তদুত্তরে উপাধ্যায় মন্তব্য করেন : "I have already made a statement. I don't want to say anything more." অর্থাৎ ইতিপূর্বেই আমি এক বিবৃতি দিয়েছি। আমি আর নতুন কিছু বলতে চাই না * (১৪৫)।

ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তর

আদালতে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উপাধ্যায়কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। অনিয়মে ও

* (১৪৫) ১লা অক্টোবর, ১৯০৭ সনের 'বন্দে মাতরম্' পত্রে "Sandhya Sedition Case" দ্রষ্টব্য।

Manager and the Printer have not only been arrested but ordered to rot in *hajat*. This is the first time in the history of sedition trials in Bengal that the accused are refused bail...But times are changing rapidly and with the prospect the perspective too must change...If the bureaucracy really thinks that by this measure it can suppress the paper it will soon find that it leans on a bruised reed for support. The bureaucracy has failed to suppress the *Yugantar* effectually by two successive prosecutions and consequent convictions. The bureaucracy has not the power to stop the tide that is sweeping over the country. In the meantime the sufferers will find solace in the sympathy of their countrymen and the approbation of their own conscience"* (১৫০).

অর্থাৎ দমননীতিতে ব্রতবদ্ধ সরকার 'সন্ধ্যা' পত্রের বিরুদ্ধে আবার মামলা রুজু করেছে। পত্রিকার ম্যানেজার ও মুদ্রাকর শুধু গ্রেপ্তার হয়েছেন তা নয়, তাঁদের হাজতে পচিয়ে মারবার আদেশও হয়েছে। বাংলাদেশে সিডিশান মামলার ইতিহাসে এই প্রথম যখন জামিনেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খালাস পেলেন না।...কিন্তু সময় দ্রুত বদ্‌লে যাচ্ছে, পরিবেশও পাল্টাচ্ছে।...যদি শাসকগোষ্ঠী সত্যসত্যই ভেবে থাকেন যে, এই ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা তাঁরা পত্রিকাখানিকে দমন করতে সমর্থ হবেন, তবে তাঁরা শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে তাঁরা এক দুর্বল ভিত্তির উপর ভর করে চলেছেন। পর পর দু'বার মামলা করেও শাসকগোষ্ঠী 'যুগান্তর' পত্রিকাখানিকে যথাযথভাবে দমন করতে পারেন নি। দেশের

* (১৫০) 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৫শে অক্টোবর, ১৯০৭) "The 'Sandhya' Again" শীর্ষক সম্পাদকীয় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

উপর দিয়ে আজ যে নবভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকে রোধ করবার শক্তি তাঁদের নেই।

উপাধ্যায়ের তিরোধান

'সন্ধ্যা' পত্রের উপর দ্বিতীয়বার সরকারী আক্রমণের কাহিনী যথাসময়ে হাসপাতালে উপাধ্যায়ের কানে পৌঁছুলো। সারদাচরণ 'সন্ধ্যা'র কাজ করতে করতে অভুক্ত অবস্থায় জেলে গেলেন একথা চিন্তা করে উপাধ্যায় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সারদাচরণকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন * (১৫১)। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে সারদাচরণের প্রতি পুলিশী নির্মমতার কথা শুনে তিনি আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। নিরপরাধ সারদাচরণের মুক্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোন্নতির মধ্যে অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘট্‌লো। ২৬শে অক্টোবর শনিবার মধ্য রাত্রি থেকে তাঁর

* (১৫১) "সন্ধ্যা সিডিশান মামলা" আরম্ভ হবার প্রাক্কালে উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রে সারদাচরণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "এক বৎসর আজ সারদাচরণ সন্ধ্যার ভার লইয়াছেন। সন্ধ্যার ভার যে কি দুর্বহ তা লোকে জানে না। একটী পয়সা পুঁজি নাই—অথচ বিপুল খরচ। রোজ রোজ টাকা আসিলে তবে সন্ধ্যা চলে। যদি কোন দিন ডাকের অনুগ্রহ কম হয়—যদি বিল আদায় না হয় ত কান্নাকাটি পড়িয়া যায়। এদিকে কিন্তু সন্ধ্যা কাগজের মত আড়ম্বর আর কোথাও নাই—দিনরাত্রি ছাপা চলিতেছে। সন্ধ্যা আপিসে আসিয়া দেখ—একটা ছেঁড়া পুরানো সতরঞ্চিতে বসিয়া লেখকেরা লিখিতেছেন —আর তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছেন।...

"এই দীনতার—এই দরিদ্রতার বোঝা মাথায় করিয়া আমাদের সারদাচরণ দিনের পর দিন সন্ধ্যার সেবা করে। সারদাচরণের পরনে ছেঁড়া কাপড়—গায়ে জামা নাই—সমস্ত দিন সন্ধ্যা লইয়া ব্যস্ত। কবেকার একটী কোট ও গায়ের কাপড় আছে—তাই লইয়া সারদা ভদ্রতা রক্ষা করে। আর আহারের দুর্দশার কথা শুনিলে চোখে জল আসে। ভাত আর একটা তরকারি হইলেই যথেষ্ট। সারদাচরণ সন্ধ্যার তহবিল হইতে পারিশ্রমিকস্বরূপ একটী পয়সাও গ্রহণ করেন না।"—৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনের 'সন্ধ্যা' পত্রে প্রকাশিত "আমাদের সারদাচরণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অবস্থা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে এগুলো। পরদিন ২৭শে অক্টোবর রবিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অসমাপ্ত বিচারের মাঝখানে এই মহান বীরের মৃত্যু ইংরেজ শাসনের উপর ধিক্কার বিশেষ। উপাধ্যায় বিচারের সময় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বিদেশী সরকারের কাছে তাঁর কৃতকর্মের জন্য কোনরূপ জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ইংরেজের আইন ও বিচারবুদ্ধিকে তিনি উপহাস করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু তাঁর বাণীকে অমরতা দান করলো।

পরিশিষ্ট (ক)

বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব*

১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও প্রাথমিক সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের পাশে আর একজন শক্তিমান পুরুষ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তিনি সেই কীর্তিমান উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গঠনে কবির সহকর্মীরূপে উপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলের ধারণা আজও অস্পষ্ট।

১৯৩৩ সনে বিলাত থেকে প্রকাশিত "রিন্যাসেণ্ট্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে ডক্টর জ্যাকেরিয়াস্ লিখেছিলেন, উপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্য অণিমানন্দ ১৯০১ সনে কলিকাতার উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কয়েকমাস পরে তাঁদের সঙ্গে আর এক তৃতীয় ব্যক্তি মিলিত হলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে কলিকাতার বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হলো। এইভাবে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যালয়ই পরে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণতি লাভ করে।

ডক্টর জ্যাকেরিয়াসের মন্তব্য অসত্য বিবেচনা করে ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে "শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অসত্য উক্তি" নামক এক সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে লিখলেন, "শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় নামক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পিতৃদেব মহর্ষির অনুমতি লাভের বহুকাল পরে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে ঐ বিদ্যায়তনের কার্য আরম্ভ হবার পরে কবির সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের পরিচয় ঘটে।...ব্রহ্মবান্ধব ও অণিমানন্দ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ে যোগদান করা তো দূরের কথা এমন কি এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও

* ১৯৬১ সনের ১৬ই এপ্রিল 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন না।" শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা কালে তিনি শিক্ষকতার বিষয়ে নিজ অনভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। তখন উপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্য অণিমানন্দ এ বিষয়ে কবিকে সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা উভয়েই কবি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বোলপুরে যোগদান করেন। তখনই ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে কয়েকটি ছাত্র ছিল; উপাধ্যায় ও অণিমানন্দ তাতে আরও কয়েকটি ছাত্র যোগ করে দিলেন। প্রায় ঐ একই সময়ে 'প্রবাসী' পত্রেও অনুরূপ মত প্রচারিত হলো।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও তাতে ব্রহ্মবান্ধব-অণিমানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হলে শ্রদ্ধেয় কার্তিকচন্দ্র নান (যিনি নিজ বাড়ী ১৮নং বেথুন রো থেকে একদা 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যাঁর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে মাঝে মাঝে উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ও যাঁর চোখের সামনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কার্তিকচন্দ্র নান ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৩ সনে রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

কলিকাতা ৬।৮।৩৩
১৮, বেথুন রো

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বহুকাল পরে আপনাকে পত্র লিখ্‌ছি—যেন একটা যুগ অতিবাহিত হোয়ে গেছে। তবে এক সময়ে যথেষ্ট পরিচয় ও পত্র বিনিময় ছিল বলে আশা করি আমাকে স্মরণ করতে বিলম্ব হবে না।

গত ৩০ বৎসরে অনেক পরিবর্তন হোয়েছে যা সব থেকে আমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক হোয়ে আছি। ঘটনাচক্রে শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গে বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিকদের মন্তব্য ও শ্রীমান অমিয়চন্দ্রের মারফতে আপনার বক্তব্য পাঠ

করে মনে হলো এ বিষয়ে আপনারও ঘটনাগুলির পারম্পর্য ঠিক মনে নাই ও সেগুলি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।

উপাধ্যায় মহাশয় *Sophia* ও *Twentieth Century* পত্রে আপনার কবিতার সমালোচনা কালে আপনাকে সর্বপ্রথম World Poet আখ্যা প্রদান করেন। ইহা বোধ হয় আজ খুব কম লোকই জানেন—সে আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে। সেই সময়ে বা কিছু পরে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎকালে আপনি তাঁহাকে ও আমাদের শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই উপাধ্যায় মহাশয়, আমার এক আত্মীয়, আমি ও আমার পুত্র সুধীর ২।১ দিনের জন্য বোলপুরে আপনার অতিথি হই। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল না। উপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে আপনি বলেন আপনারও ঠিক সেইরূপ অভিপ্রায় অনেকদিন ধরিয়া আছে কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নাই। আপনাদের মিলিত উৎসাহে তখনই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সুরু হয়। সে এক অপূর্ব সমাবেশ—একজন বিশ্বকবি ও আর একজন আজীবন ব্রহ্মচারী। দুইজনেই দুজনার গুণে মুগ্ধ। কলিকাতায় ফিরিয়া উপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না—কারণ সিমলা ষ্ট্রীটে তখন তাঁহার একটি বিদ্যালয় ছিল—সেইটি ভাঙ্গিয়া দিলেন ও আমার পুত্র সুধীর, ভাগিনেয় রাজেন ও তাঁহার বন্ধুপুত্র গোরা, কালা, নন্দ ও আরও গুটিকতক ছাত্র লইয়া উপাধ্যায় মহাশয় ও আমি বোলপুর গেলাম। উপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য রেবাচাঁদ (এখন অণিমানন্দ) ২।১ দিন পরে আরও কয়েকটি ছাত্র লইয়া উপস্থিত হইল। আপনিও ওদিকে ২।৩ জন শিক্ষক আরও জনকয়েক ছাত্র ও অন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলেন ও রেবাচাঁদ পৌঁছিবামাত্র তাহাকে প্রধান শিক্ষকের ভার অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়েরই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনি তখন বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর আশ্রমটি গঠিত করেন। ছাত্রদের বর্ণ হিসাবে প্রাতঃসন্ধ্যার নিমিত্ত সাদা, বেগুনি, লাল ও হরিদ্রা রং-এর পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় ও আপনিই তাহাদের

"গুরুদেব" পদে অধিষ্ঠিত হন। সকলকেই গায়ত্রী পাঠের ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে একটি মাত্র তিন কক্ষ পাকা গৃহে আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। আমিও কিছুদিন শান্তি-নিকেতনে অবস্থান করিয়াছিলাম। আপনার হয়ত মনে থাকিতে পারে মীরা ও সমীকে যৎকিঞ্চিৎ চিত্রবিদ্যা শিখাতাম, তবে তাহারা আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। রথী ও সন্তোষ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় নাই।

আমার বক্তব্য এই যে আপনাদের দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম উৎপত্তি হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বিদ্যালয়ে আপনি যোগদান করিয়াছিলেন তাহা ভিত্তিহীন ও আপনার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপাধ্যায় মহাশয় যোগ দেন তাহাও ঠিক নহে। এ বিষয়ে আপনি যদি প্রবাসী ও *Modern Review* পত্রিকায় একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেন তাহা হইলে বোধ হয় সকল দিক দিয়া ভাল হয়। আপনি আমার যথাবিহিত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪০।

ভবদীয়
শ্রীকার্তিকচন্দ্র নান।

এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৩ সনে কার্তিকচন্দ্র নান মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখে পাঠান—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে অনেকদিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। তোমার বক্তব্য সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে তা যথাসময়ে কাগজেপত্রে দেখতে পাবে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে কাজের দায়িত্ব নিতে অক্ষম হয়েছি। ইতি ৮ অগষ্ট ১৯৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে ব্রহ্মবান্ধবের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে তা যথাসময়ে তোমাকে লিখে দিতে পারব। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত তাই কারো দায়িত্ব নিতে অক্ষম হয়েছি। ইতি ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ
২৮ বেথুন রো
কলিকাতা

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

এর পরবর্তী ধাপ হলো রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ ('প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৪০)। ঐ প্রবন্ধে উপাধ্যায় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, " উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত *Twentieth Century* পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে-প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সে-রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি। বস্তুত এর অনেককাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে-সম্মান পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে সেই রকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সঙ্কল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সঙ্কল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ, ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ, আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন।...অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ—তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ—বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসম্ভব হ'ত। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাবি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্চে।... শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"

উপরে উদ্ধৃত কার্তিকচন্দ্র নানের পত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (ডিসেম্বর, ১৯০১) কিছুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ও উপাধ্যায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত

পরিচয় ঘটে ও এই পরিচিতি ক্রমে পারস্পরিক বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিংশ শতকের প্রারম্ভে (১৯০০) উপাধ্যায় সিন্ধুদেশ ছেড়ে কলিকাতায় চলে আসেন ও বাংলাদেশকেই তাঁর পরবর্তী কর্মভূমিরূপে গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি সাপ্তাহিক 'সোফিয়া'য় (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০০) রবীন্দ্রনাথকে "বাংলার বিশ্বকবি" বলে সম্বর্ধনা জানান ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, অন্য কোনো কারণে না হলেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্যই বিদেশীদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে। ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) আবির্ভূত হলে উপাধ্যায় প্রথম দিকে উক্ত পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর কোনো কোনোটি রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা'ছাড়া, জুলাই, ১৯০১ সনে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' মাসিকে কবির 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের উপর উপাধ্যায়ের যে সহৃদয় সমালোচনা বের হয়, তাতে কবি কতখানি খুশী হয়েছিলেন সেকথা তিনি নিজেই পরবর্তী কালে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, সে সময়েই কথাপ্রসঙ্গে কবির বিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনার বিষয়ে উপাধ্যায় অবগত হন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির কাজে সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক উপাধ্যায়-শিষ্য রেবার্চাঁদ বা অণিমানন্দের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেপ্টেম্বর, ১৯০১ সনে ব্রহ্মবান্ধব রেবার্চাঁদের সহায়তায় কলিকাতার সিমলা বাজার ষ্ট্রীটে একটি ছোট্ট বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি প্রাচীন বৈদিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় উপাধ্যায় তাঁর ছাত্র কার্তিকচন্দ্র নানের বাড়ীতে ১৮নং বেথুন রো'তে থাকতেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঐ বাড়ীতে আসতেন ও উভয়ে মিলে বহুক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা চালাতেন। এই সকল আলোচনা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে উপাধ্যায়ের আন্তরিক সাড়া লাভ করে রবীন্দ্রনাথ এই শুভ কাজে ব্রতী হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে উভয়ে রেবার্চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে একবার আশ্রম পরিদর্শন করে আসেন ও অল্পদিন

পরেই—ডিসেম্বর, ১৯০১ সনে—বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। রেবাচাঁদ তাঁর "স্বামী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" (কলিকাতা, ১৯০৮) নামক ইংরেজি গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ২৮), ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে সিমলা ষ্ট্রীটের বিদ্যালয়টি বোলপুরে স্থানান্তরিত হলো। বোলপুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষণ থেকে উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদের আশ্রম পরিত্যাগের সময় পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯০১—আগষ্ট, ১৯০২) সিমলা ষ্ট্রীটের বিদ্যালয়ের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহই উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ বোলপুরে গমন করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে ও পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সিমলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত উপাধ্যায়ের স্কুলটির বিষয়ে অবহিত ছিলেন না রামানন্দবাবুর এই উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। সিমলা ষ্ট্রীটের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন না একথা সত্য ; কিন্তু একথা সত্য নয় যে, তিনি ঐ বিদ্যালয়ের কথা জানতেন না। তা'ছাড়া, বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্বে উপাধ্যায়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের আসা-যাওয়া ও উভয়ের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গ যদি সত্য বলে স্বীকার করি, তা'হলে রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের নিকট তাঁর সিমলা ষ্ট্রীটের কথাও শুনে থাকবেন এটাই বিশ্বাস্য বলে মনে হয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এই বিষয়ে অণিমানন্দ লিখেছেন, "স্বামীজীর সঙ্গে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একদিন উক্ত বিদ্যালয়ে কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন ও সে সময় ছেলেরা পূর্ব-নির্দেশমত তাঁর চরণ স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম জানায়। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই, ডিসেম্বর, ১৯০১ সনে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, স্বামীজী কর্তৃক সংগৃহীত আরও কয়েকজন এবং কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রথম ব্রহ্মচারীর দল গঠন করে" ('মডার্ণ রিভিয়ু' জুন, ১৯৩৫)।

বোলপুরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনে উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম আদি ছাত্র গৌরগোবিন্দ গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। গৌরগোবিন্দবাবুর বয়স বর্তমানে ৭১ বৎসর।

তিনি সুদীর্ঘকাল রংপুর কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বড় জ্যেষ্ঠতাত উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন উপাধ্যায়ের সহপাঠী। এই সূত্রে উপাধ্যায় ১৯০১ সনের শেষভাগে (বোধ হয় নভেম্বরে) তাঁর সহপাঠী উপেন্দ্রবাবুর নিকট হতে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই-এর ছেলে গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ও মেজো ভ্রাতুষ্পুত্র অশোককুমার গুপ্তের বোলপুর গমনের অনুমতি সংগ্রহ করেন।

এই দুইজন ছাত্র ছাড়াও উপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য আরও তিনজন ছাত্র সংগ্রহ করেন। এঁরা হলেন গিরিন ভট্টাচার্য ('বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদক যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর গুরুপুত্র), যোগানন্দ মিত্র (দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) ও সুধীরচন্দ্র নান (কার্তিকচন্দ্র নানের পুত্র)। রবীন্দ্রনাথের তরফে ছাত্র ছিলেন তাঁর দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। এই সাতজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। উপাধ্যায়ের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আরও দুইজন ছাত্র এসে প্রথম দলে যোগদান করেন। এঁদের একজন হলেন সুধীর নানের পিসতুতো ভাই রাজেন্দ্রনাথ দে ও অশোককুমার গুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রেমকুমার গুপ্ত। শান্তিনিকেতনের ছাত্রসংখ্যা এবার দাঁড়ালো সর্বসমেত নয়।

গৌরবাবু আরও বলেন যে, গোড়ার দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব, রেবাচাঁদ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ রায়চৌধুরী ও সুবোধ মজুমদার। কিন্তু রেবাচাঁদই ছিলেন ছাত্রদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। উপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা থেকে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করতেন ও বিদ্যালয়ের পরিচালনাকার্যে রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিতেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্মকালে উপাধ্যায় ও তৎশিষ্য অণিমানন্দ (বা রেবাচাঁদ) যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বিষয়ে অণিমানন্দ নিজেও লিখেছেন, "উপাধ্যায়জী মাঝে মাঝে আশ্রম পরিদর্শন করতে আসতেন ও পরিচালকরূপে সাহায্য করতেন। আর অণিমানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়করূপে দিবারাত্রই ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন, এবং স্বামীজীর নির্দেশে ও কবির সমর্থনে ক্লাসের পড়াশুনা ছাড়াও

আশ্রম জীবনের সকল কাজ দেখাশোনা করতেন ও তাতে অংশ গ্রহণ করতেন" ('মডার্ণ রিভিয়ু', জুন, ১৯৩৫)। আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনায় উপাধ্যায় মহাশয়ই যে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন, সে-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের গঠনে উপাধ্যায় ও তৎশিষ্য রেবাচাঁদ রবীন্দ্রনাথের সহকর্মিরূপে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেও কেন তাঁরা মাত্র আট মাস পরেই আশ্রম-বিদ্যালয় ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা পাঠক সমাজের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ডক্টর জ্যাকেরিয়াস্ তাঁর "রিন্যাসেণ্ট্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "উপাধ্যায়কে চলে আসতে হয় কবির উপর তাঁর অতিরিক্ত প্রভাব ছিল বলে, আর অণিমানন্দকে চলে আসতে হয় ছাত্রদের উপর তাঁর অতিরিক্ত প্রভাব থাকার পরিণামে।" ডক্টর জ্যাকেরিয়াসের এই মন্তব্য অস্বীকার করে রামানন্দবাবু 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "উপাধ্যায় স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই ঐ বিদ্যালয় ছেড়ে আসেন আর অণিমানন্দকে ছাড়তে হয়েছিল ছাত্রদের উপর তাঁর অতিরিক্ত প্রভাব ছিল বলে নয়, অন্য কোনো কারণে যে-কথা কবি আমাদের বলেছেন। এই কারণটি কবি এবং আমরা বাধ্য না হলে প্রকাশ করতে চাই না" ('মডার্ণ রিভিয়ু', আগষ্ট, ১৯৩৩)।

রামানন্দবাবুর এই মত প্রকাশিত হবার পর শ্রীযুত কার্তিকচন্দ্র নান রবীন্দ্রনাথের নিকট নিম্নলিখিত মর্মে দ্বিতীয় পত্র লিখে পাঠান। পত্রখানি নিম্নরূপ :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যথাসময়ে পত্রের উত্তর পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। প্রথম পত্র লিখিবার পর অগষ্টের *Modern Review*-এ Dr. Zacharias লিখিত 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের উৎপত্তি'র বিবরণ সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তারিত সমালোচনা পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে পূর্বে যাহা লিখিয়াছি তাহা ছাড়া বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে শেষ ২।১ ছত্র পড়িয়া মনে

হয় যেন রেবাচাঁদের স্কুল ত্যাগ সম্বন্ধে তাহার চরিত্রের উপর কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।—এ বিষয়ে আপনার নামের উল্লেখ থাকায় উপাধ্যায় মহাশয় ও রেবাচাঁদের বিদ্যালয় ত্যাগের কথা আমার যাহা মনে আছে তাহা আপনাকে জানাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতেছি। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাস কতক পরেই মহর্ষি শান্তিনিকেতনে খৃষ্টীয়ানদের উপস্থিতিতে আপত্তি জানান—এ কথা জানিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধ্যায় মহাশয় রেবাচাঁদকে লইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার সঙ্কল্প করেন। ইহাতে আপনি বড়ই উতলা হইয়া পড়েন কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় আপনাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে তাঁহারা দূরে থাকিয়াই যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করিবেন ও কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনার আশ্রমের জন্যই নিম্নবয়স্ক ছাত্রদের গড়িয়া তুলিবেন। দুঃখের বিষয় উপাধ্যায় মহাশয় ও রেবাচাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় উপাধ্যায় স্থাপিত কলিকাতার বিদ্যালয়টি স্বল্পায়ু হয়। ইহার পরেও রেবাচাঁদকে আপনি গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন ও এক সময়ে তাহার স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে তাহার উচ্চপ্রশংসাও করেন। ইহাতে মনে হয় না যে তাহার উপর সে সময়ে আপনার কোনওরূপ অনাস্থা জন্মাইয়াছিল।

আশা করি আপনার শারীরিক অবসাদ দূর হইয়াছে ও এখন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। ইতি ১৬ই অগষ্ট ১৯৩৩।

—প্রণতঃ

কার্তিকচন্দ্র নান।

এই সকল ঘটনার অব্যবহিত পরে অণিমানন্দ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখিত (কিন্তু অ-প্রেরিত) একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ করেন, "১৯০২ সনে শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসবার পরেও কয়েকবার আমি শান্তিনিকেতনে আমার পুরানো কাজ পুনরায় গ্রহণ করবার জন্য আহূত হয়েছিলাম; এবং প্রতিবারই সেই সহৃদয় আমন্ত্রণ আমাকে অস্বীকার করতে হয়েছিল, তার কারণ কলিকাতায় সে সময় আমার যে স্কুলটি ছিল, তা তখন ভেঙ্গে

দেওয়া বা শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর ছিল না।" উক্ত পত্রেই অণিমানন্দ তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যখন যখন তিনি কবি বা কবি-পুত্র কর্তৃক শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রথমত, "মহর্ষির মৃত্যুর অল্পকাল পরে, জোড়াসাঁকোয় আপনার যে দুই পুত্রের আমি গৃহশিক্ষক ছিলাম, তারা যখন শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিল তখন আমাকেও ঐ সঙ্গে বোলপুরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।" দ্বিতীয়তঃ, "১৯০৯ সনের ৩১শে মে তারিখে যখন আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম,—আগের দিন 'হোম'-এ পুরস্কার বিতরণী সভায় আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদের অনুগৃহীত করায় আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে—সে সময়ও আমাকে ঐ একই অনুরোধ জানানো হয়েছিল।" তৃতীয়ত, "যখন স্বর্গত সন্তোষ মজুমদার ও বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে 'বয়েজ ওন্ হোম'-এ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সে সময়ও তাঁরা আমাকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।"

অণিমানন্দের শিক্ষকতায় কবির যে কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, উপরে সন্নিবেশিত ঘটনাবলী তার প্রমাণ। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার পরে উপাধ্যায় ও অণিমানন্দ পুনরায় সিমলা ষ্ট্রীটের স্কুলটি খুলেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৯০৪) উপাধ্যায়ের সঙ্গে অণিমানন্দের মতবিরোধ দেখা দিলে অণিমানন্দ পৃথকভাবে 'বয়েজ্ ওন্ হোম' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়েই ১৯০৯ সনের পুরস্কার বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন (জুন, ১৯০৯), অণিমানন্দ বাস্তবিকই আচার্যের আসন লাভের অধিকারী, এবং যে সকল ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে তারা যথার্থই ভাগ্যবান ('বয়েজ ওন্ হোম প্রস্পেক্টাস্,' ১৯২৩ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পত্র উদ্ধৃত করছি। পত্রখানি শান্তিনিকেতন থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ সনে লিখিত হয়েছিল।

বাঁধানো সচিত্র বাইবেল উপহার দিয়ে যান। পুস্তকটি ইংরেজিতে লেখা, অক্ষরগুলি বড় বড়, প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি ছিল। বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর খোলা শেল্‌ফে বইখানি রাখার পরই গৌরবাবুর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁকে সব সময়ই ঐ বইখানি নাড়াচাড়া করতে দেখা যেতো। তাঁর আগ্রহ দেখে রেবাচাঁদ খুশী হয়ে সরল ইংরেজিতে ছবিগুলির অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন। ঐ উপলক্ষেই বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষক খৃষ্টান রেবাচাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের জল্পনা-কল্পনা শেষ পর্যন্ত মহর্ষির কানে পৌঁছুলো। এইরূপ কানাঘুষা কথাবার্তা শুনামাত্রই উপাধ্যায় রেবাচাঁদকে অনতিবিলম্বে বোলপুর বিদ্যালয় ছেড়ে আসবার পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে এক পত্র লেখেন। এইভাবে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃষ্টান ছিলেন বলে সে সময় কেহ কেহ যে আপত্তি তুলেছিলেন সে-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন, যদিও তিনি পরিষ্কার ভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ আপত্তিতে মহর্ষি কোনোরূপ সায় দেন নি। "কেহ কেহ এমন কথা লিখেচেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃষ্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ-কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, 'তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা ক'রে এসেচি," (রবীন্দ্রনাথের "আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ইতিপূর্বে আর কোথায়ও প্রকাশিত হয় নি। এই অপ্রকাশিত চিঠিগুলি "সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে"র খ্যাতনামা অধ্যাপক ফাদার টুম্‌স্‌-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

পরিশিষ্ট

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গ

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন। এর আনুষ্ঠানিক জন্ম ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট। তার প্রায় দেড় বছর পূর্বে ভারত সরকারের এক সার্কুলারে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম প্রচারিত হয়। এই পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সহরে-মফঃস্বলে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উত্থিত হলো। ১৯শে জুলাই, ১৯০৫ সনে সিমলা থেকে ভারত সরকার প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হলো। ইংরেজ সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপমানিত ও বেদনাহত নিরস্ত্র জাতি আবেদনের পথ এবার পরিহার করে 'বয়কট' অস্ত্র হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। ৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ সনে কলিকাতার টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় বাংলার জননায়কগণ স্বদেশীর নামে বিদেশী পণ্য বর্জন-নীতি গ্রহণ করলেন। ১৯শে জুলাই ও ৭ই আগষ্টের মধ্যবর্তী দিনগুলি ছিল আসন্ন সংগ্রামের উদ্যোগ-পর্ব বিশেষ। প্রতিদিন জননায়কদের শলা-পরামর্শ চল্‌ছে। ২০শে জুলাই 'সঞ্জীবনী' পত্রে কৃষ্ণকুমার মিত্র বাঙালী জাতিকে পবিত্র মাতৃ-ভূমির নামে স্বদেশী ব্রত গ্রহণের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। এই রাষ্ট্রিক পরিবেশে জুলাই মাসের শেষাশেষি কোনো অদৃশ্য হস্ত লিখিত "সোনার বাংলা" নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। হাজার হাজার কপি মুদ্রিত হয়ে ঐ পুস্তিকা পূর্ববঙ্গের সহরে গ্রামে প্রচারিত হতে থাকে। ৭ই আগষ্টের সার্বজনিক সভায় 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হবার অব্যবহিত পরে "সোনার বাংলা" নামে আরও একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হতে থাকে। উভয় পুস্তিকার ভাবধারা প্রায় একই, পার্থক্য যা লক্ষণীয় তা শুধু প্রকাশকালের ও বহরের। প্রথমটি ৭ই আগষ্টের পূর্বেকার রচনা, আকারে একটু বড়; দ্বিতীয়টি ৭ই আগষ্টের পরবর্তী প্রকাশনা, তুলনায় আকারে ছোট। "সোনার বাংলা" নামে এই দুই পুস্তিকার

উৎপত্তি স্থল ছিল কলিকাতা। তা'ছাড়া, ঐ একই নামে ঐ ধরণের অন্যান্য পুস্তিকা, এমন কি কবিতাও, পূর্ববঙ্গের নানা সহরে আগষ্ট মাস থেকেই প্রচারিত হতে থাকে—যেমন, বগুড়ায় ও রাজসাহীতে। বগুড়া ও রাজসাহী থেকে সংগৃহীত "সোনার বাংলা" পুস্তিকার প্রতি ১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসেই সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় * (১)। প্রথম দিকে সরকার ঐ পুস্তিকার উপর তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করে নি। কিন্তু অল্পদিন পরই এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতা দূরীভূত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন স্থরু হলে বাংলার ছাত্রসমাজ তাতে প্রথম থেকেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ৭ই আগষ্টের সার্বজনিক সভার পর স্বদেশী ও বয়কট মন্ত্র প্রচারে তাদের উৎসাহ ছিল সীমাহীন। বাংলার সর্বত্র যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনা স্থরু হয়, তরুণদলের সক্রিয় অংশগ্রহণ তার গতিকে তীব্রতর করে তুলেছিল। তাদের দেশাত্মবোধের প্রদীপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে সেদিনকার ইংরেজ সরকার বিচলিত হয়ে উঠলো। ৩রা অক্টোবর ১৯০৫ সনে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামেশ্বর চক্রবর্তী বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা মিঃ পেড্‌লারকে এক পত্রে জানান যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের কুপ্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে ও তাদের লেখাপড়া গোল্লায় যাবার উপক্রম হয়েছে। তিনি আরও লেখেন যে, সরকার যদি এখনই ছাত্রসমাজকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য স্থপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণ না করে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। কলিকাতা থেকে কংগ্রেসী নেতারা মফঃস্বলে এসে উত্তেজনামূলক বক্তৃতাদি প্রদান করে ছাত্রদের মনকে ক্রমশই চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল করে দিচ্ছেন। পরিশেষে তিনি ঐ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের জন্য মিঃ পেড্‌লারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন * (২)।

* (১) *Bengal Abstract* dated 19th August, 1905

* (২) "I would respectfully pray, Sir, that you may be pleased to devise measures to call off students from the forbidden and unsafe grounds of politics." Vide *I. B. Records*, File No. 477 of 1907, p. 3

ঐ পত্র প্রেরণকালেই চক্রবর্তী মহাশয় পেড্‌লারের অবগতির জন্য "সোনার বাংলা" পুস্তিকার একখানি কপিও পাঠিয়ে দেন।

কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এই পত্র সরকারী দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্র লিখিত হবার মাত্র সাতদিন পরে (১০ই অক্টোবর, ১৯০৫) বাংলা সরকারের গোপনীয় কার্লাইল সার্কুলার ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট প্রেরিত হয়। কার্লাইল সার্কুলারের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। তবে রামেশ্বর চক্রবর্তীর লেখা চিঠির সঙ্গে ১০ই অক্টোবরের গোপনীয় কার্লাইল সার্কুলারের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। কারণ অক্টোবর মাসের শেষদিকেই মিঃ পেড্‌লার রামেশ্বর চক্রবর্তীর চিঠি ও তৎপ্রেরিত "সোনার বাংলা" পুস্তিকার প্রতি বাংলা সরকারের চীফ্‌ সেক্রেটারী মিঃ আর, ডব্‌লু, কার্লাইলের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন (২৪শে অক্টোবর)। ৩১শে অক্টোবর বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি নির্দেশ দেন ঐসব কাগজপত্র যেন নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের চীফ্‌ সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, লায়নকে প্রেরণ করা হয়। তদনুসারে ১লা নবেম্বর, ১৯০৫ সনে কলিকাতা থেকে লায়নের নিকট ঐসব কাগজপত্র অর্থাৎ রামেশ্বর চক্রবর্তীর চিঠি ও "সোনার বাংলা" পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ প্রেরিত হয় * (৩)। সেই পুস্তিকার মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ আজও পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত পুরানো ফাইলে দৃষ্ট হয়। পুস্তিকার ভাষা ছিল অত্যন্ত নগ্ন আর সুর ছিল নিম্নরূপ :

"শুধু কথায় আর চলবে না। কাজ চাই। রক্তদান ছাড়া রক্তবীজের জাতিকে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। ফিরিঙ্গি আমাদের দুঃখ-দুর্দশার উপর অপমানের বোঝা চাপিয়েছে। আমরা যথেষ্ট খেতে পাই না। সুখাদ্যের অভাবে আমরা ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হই, ওলাউঠা ও মড়ক দেশজুড়ে

* (৩) *I. B. Records*, F. N. 477 of 1907, p. 1

দেখা দেয়। তদুপরি তারা আমাদের সোনার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বাঙালীর শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তারা বাঙালীকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তারা খাজনাপত্র বাড়িয়ে দিচ্ছে ও চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থা বিনষ্ট করতে তারা উদ্যত। বাংলার সর্বনাশের দিন আসন্ন। বঙ্গমাতার সুসন্তান কি কেহ নেই? তোমরা কেন এই দুর্দিনে মৌন হয়ে রয়েছ? প্রস্তুত হও, মৃত্যুবরণের জন্য তৈরী হও, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ো না। জন্মগ্রহণ করলেই মরতে হবে। বীরের মত আচরণ কর। অসুরের রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর। হিন্দু-মুসলমানের সোনার বাংলা ছারখার হতে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান ভাইগণ, তোমরা ফিরিঙ্গির ন্যায় নেমকহারাম নও। যার নুন খাও তার প্রতি নেমকহারামি করা তোমাদের স্বভাব নয়। তবে কেন তোমরা এতটা নিশ্চেষ্ট? তোমাদের উপর কৃত অন্যায়ের প্রতিবিধান সাধনে তোমরা দলবদ্ধ হও। ভুলে যেয়ো না অসুরের ধর্ম মাতৃরক্ত পান করা। যে জাতি আমাদের মাতৃদেবীকে হত্যা করতে চায় সে আমাদের শত্রু—সেই শত্রুর বিনাশ-সাধন মহাপুণ্য। মনে রেখো ইংরেজ আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তার অত্যাচারে আমাদের জাত ও ধর্ম নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, আমাদের মা-বোনেরা অনাহারে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। চোখ থাকলে চোখ খুলে দেখো, অন্যায়ের প্রতিবিধান কর। আমরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছি। জেলখানার ভিতর ও বাহির উভয়ই আমাদের কাছে সমান। তোমাদের জন্মকুল যদি ঠিক থেকে থাকে, যদি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ এখনও অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে আর কালাতিপাত না করে মায়ের দুর্দশা মোচনে ও ফিরিঙ্গি বিতাড়নে সংঘবদ্ধ হও। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মিলন-সাধন তোমাদের লক্ষ্য হোক্।

দেশী জিনিস ব্যবহার করা অতীব প্রয়োজনীয়। স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা তোমরা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। জীবিকার জন্য তোমাদের আর কুক্কুরের মত অপরের দ্বারস্থ হতে হবে না। হে ছাত্রগণ, হে যুববৃন্দ, তোমরাই সোনার বাংলার আশা-ভরসা। অগ্নিকে সাক্ষী করে, ভগবান ও পূর্বপুরুষদের নাম স্মরণ করে তোমরা সংগোপনে সংঘবদ্ধ হও। কিন্তু

পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কিছু করো না। তা'হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ সাধনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে।

আত্মবলিদান ছাড়া কোনো মহৎ কাজ অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু বাগাড়ম্বরে কাজ এগোয় না। খুব সাবধান, তোমাদের শত্রু যেন কোনপ্রকারে তোমাদের হাড়ির খবর না পায়। তাই বলে ভীরুতাও অবলম্বন করো না। সত্য ও ধর্ম জয়যুক্ত হবেই। কাজ চাই, শুধু বাগাড়ম্বর নয়। কাজে ব্রতী হলে তোমাদের পাশে আমাদের দেখতে পাবে। সোনার বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তোমরা দল বাঁধো। সংগ্রামের দিন সমাগত। ভারতের অন্যান্য জাতিরা প্রস্তুত, তোমরা বাঙালী ভাইগণ পিছনে পড়ে থেকো না। এগিয়ে চলো। সকলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে" * (৪)।

ঐ একই সময়ে (১লা নভেম্বর, ১৯০৫) কলিকাতা থেকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারকে "সোনার বাংলা" নামে আর একখানি দ্বিতীয় পুস্তিকারও অনুবাদ প্রেরিত হয়। এই দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি শিয়ালদহ ষ্টেশনের সন্নিকটে পাওয়া গিয়েছিল। এরপর ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ সনে ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ লায়নকে "সোনার বাংলা" নামে একখানি রাজদ্রোহমূলক নোটিশের কথা উল্লেখ করে পত্র লেখেন। এই নোটিশ কুমিল্লার মিশন হলের গায়ে ২৬শে ডিসেম্বর টানানো ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। ৭ই জানুয়ারী, ১৯০৬ সনে ঐ নোটিশখানি নবপ্রদেশের ডি, আই, জি, স্টুয়ার্ট বেকারকে পাঠানো হয় ও ১৯শে জানুয়ারী বেকার ঐ নোটিশের ইংরেজি অনুবাদ লায়নকে প্রেরণ করেন * (৫)।

এরপর "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গ উপলক্ষে সরকারী উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু তখনও "সোনার বাংলা"র প্রচার বন্ধ হয় নি। ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "সোনার বাংলা" নিয়ে হঠাৎ হৈ চৈ পড়ে যায়। ৫ই সেপ্টেম্বর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের রক্ষণশীল মুখপত্র

*(৪) *Ibid*, p. 4 * (৫) *Ibid*, pp. 6-7

অক্টোবর, ১৯০৬ সনে পূর্ববাংলা ও আসাম সরকার এবং বাংলা সরকার উভয়েই "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যে ব্রতী হয়। কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ "সোনার বাংলা" সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও গবেষণার পর ঐ ডিটেকটিভ অফিসার পর পর ছয়খানি রিপোর্ট তৈরী করে পুলিশের ইন্স্‌পেকটার জেনার্যালের নিকট দাখিল করেন। এই রিপোর্টগুলি রচিত হয়েছিল ২রা নভেম্বর, ১৯০৬ থেকে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৭ সনের মধ্যে। ২রা নভেম্বর, ১৯০৬ সনে তৈরী প্রথম রিপোর্টে বলা হয় যে, "সোনার বাংলা" পুস্তিকার যে-দু'খানি কপি পুলিশের হস্তগত হয়েছে তার একখানি কলিকাতা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত ও প্রচারিত হয় ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্টের পূর্বে, আর অন্যখানি ঐ তারিখের পরে। নামকরণ থেকে আরম্ভ করে শব্দ প্রয়োগের কায়দা—যেমন 'রক্ত দেও', 'ভাই', 'ফিরিঙ্গি', 'অক্ষয় স্বর্গ', 'নেমকহারাম', 'দল বাঁধো' 'কোমর বন্ধ' ইত্যাদি—উভয় পুস্তিকাতেই প্রায় অনুরূপ। উভয় পুস্তিকাতেই হিন্দু-মুসলমানদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এবং উভয় পুস্তিকার নামকরণ মুদ্রণে একই ধরণের টাইপও ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু, উভয় পত্রিকায় প্রচারিত চিন্তাধারা প্রায় অনুরূপ। এমন কি বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীও উভয় পুস্তিকাতে প্রায় একরূপ। এই সমস্ত সাদৃশ্য থেকে মনে হয় যে উভয় পুস্তিকা একই হাতের রচনা।

২০শে নবেম্বর, ১৯০৬ সনে প্রেরিত দ্বিতীয় রিপোর্টে বলা হয় যে, উভয় পুস্তিকার রচয়িতা হচ্ছেন কুখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। কারণ 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে যে রচনা-প্রণালী (style) অনুসৃত হয়, তার সঙ্গে "সোনার বাংলা" পুস্তিকাদ্বয়ের

nor since has any information been received that there is any such secret society in existence, either in Calcutta or out of it." Vide the letter of the Commissioner of Police, Calcutta, dated 17th Sept., 1906 to the Director of Criminal Intelligence, Simla, as preserved in the *I. B. Records*, F. N. 477 of 1907, pp. 16-17.

রচনা-কায়দার হুবহু মিল লক্ষণীয়। ১৯০৫ সনের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে 'সন্ধ্যা'র সুর পাল্টাতে থাকে। প্রথম দিকে এই পত্রিকার ভাবও ছিল গম্ভীর, রচনাগুলিও ছিল মার্জিত রুচির পরিচায়ক, কিন্তু পরে এই পত্রিকা বিষয়বস্তুতে ও রচনা-কায়দায় পূর্বেকার গাম্ভীর্য বিসর্জন দিল, আর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দ্বিতীয় স্তরের ভাষার সঙ্গে "সোনার বাংলা" পুস্তিকার ভাষার হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায় * (১১)। এই মতের সমর্থনে উক্ত রিপোর্টের সঙ্গে 'সন্ধ্যা' পত্রে সচরাচর ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দের এক সুদীর্ঘ তালিকাও সংযুক্ত হয় এবং সেই শব্দতালিকার সাহায্যে দেখানো হয় যে, "সোনার বাংলা" পুস্তিকাদ্বয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলিও কতখানি একরূপ ও কতখানি একরকমের বানানে লিখিত হয়েছিল।

তৃতীয় রিপোর্ট দাখিল করা হয় ৫ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ সনে। ঐ রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, কালীঘাটের 'প্রতিজ্ঞা' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে বসে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ১ নম্বরের "সোনার বাংলা" পুস্তিকাখানির খসড়া তৈয়ারী করেন এবং তৎপর জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে 'প্রতিজ্ঞা প্রেসে' তা মুদ্রিত হয় পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্য দিনের বেলাতেই ঐ পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছিল। জ্যোতিলালের বয়স তখন বত্রিশ বছর। পূর্বে তিনি পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্স্‌পেকটারের চাকুরী করতেন, কিন্তু মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব 'প্রতিজ্ঞা' পত্রে প্রকাশিত লেখালেখি থেকে সহজেই দৃষ্ট হয়। 'প্রতিজ্ঞা' পত্রে মাঝে মাঝে হিংসাত্মক

* (১১) "In reading the leading articles of the *Sandhya*, one may notice that the tone of the articles last year, i e., from July to December, was of two kinds, their style also being of two sorts—one sort of style was more respectable, but the other was as bad as it is now, and this latter does exactly agree with the style of the leaflets. I therefore conclude that the leaflets were written by Brahmo Bandhab Upadhya." Vide *I. B. Records*, File No. 477 of 1907, pp. 27-28.

কর্মনীতির অনুমোদন করেও প্রবন্ধ বের হতো। ৩০শে আগষ্ট, ১৯০৫ সনে 'জাগরণ' নামে জ্যোতিলালের যে কবিতা প্রকাশিত হয় তার মধ্যেও শক্তি-যোগের সাধনায় দেশবাসীকে আহ্বান করা হয়—স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে তাদের অস্ত্রধারণ করতেও বলা হয়। উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার স্বরও রাজদ্রোহমূলক এবং জ্যোতিলালের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সহৃদয়তা সহজেই অনুমেয়।

১৯০৭ সনের ২রা জানুয়ারী চতুর্থ রিপোর্ট প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্টে বলা হয় "সোনার বাংলা" পুস্তিকা ছাড়া "রাজা কে ?" এই নামের পুস্তিকা-খানিও জ্যোতিলালের সহায়তায় উপাধ্যায়ের রচনা এবং তারও মুদ্রণ কার্য 'প্রতিজ্ঞা প্রেসে' সম্পন্ন হয়। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে, ১ নম্বরের "সোনার বাংলা" পুস্তিকা ছাপা হবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে "রাজা কে ?" পুস্তিকাখানি মুদ্রিত হয়েছিল।

তৃতীয় রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে 'প্রতিজ্ঞা প্রেসে' "সোনার বাংলা" পুস্তিকা ছাপানো হয় দিনের বেলায়, কিন্তু চতুর্থ রিপোর্টে বলা হয় তা ঠিক নয়। "সোনার বাংলা" ও "রাজা কে ?" এই উভয় পুস্তিকাই 'প্রতিজ্ঞা প্রেসে' রাত্রিবেলা উপাধ্যায় ও জ্যোতিলালের উপস্থিতিতে ছাপানো হয় * (১২)।

পঞ্চম রিপোর্ট প্রেরিত হয় ১৩ই জানুয়ারী, ১৯০৭ সনে। ঐ রিপোর্টে "সোনার বাংলা"র রচনা ও প্রকাশনা প্রসঙ্গে উপাধ্যায়, জ্যোতিলাল প্রমুখ পাঁচজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারানুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপনের বিষয় বিবেচনা করতে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ঐ মর্মে সর্বশেষ রিপোর্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয় ১৯০৭ সনের ১৭ই জানুয়ারী। ২১শে জানুয়ারী বাংলা সরকারের পুলিশ বিভাগের ইন্স্‌পেকটার-জেনারাল ষ্টিভেনসন্‌-মুর (Stevenson-Moore) চীফ্‌ সেক্রেটারী কার্লাইলকে (Carlyle) সমস্ত সংবাদ পত্র-মারফৎ অবগত করবার পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রথমত, পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক

* (১২) *I. B. Records*, F. N. 477 of 1907, p. 34

ধারানুযায়ী অভিযোগ আনয়নের পূর্বে ভারত সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, সরকারকে দেখতে হবে এই ধরণের অভিযোগ আনয়ন রাজনৈতিক দিক থেকে উচিত ("politically advisable") কিনা; তৃতীয়ত, এই মামলায় জয়লাভের সম্ভাবনার বিষয়েও সরকারকে চিন্তা করে দেখতে হবে। মিঃ মুর এর পর নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই মামলা খাড়া করবার পক্ষপাতী নন, কারণ "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গ প্রায় দেড়-বছরের পুরানো; তা'ছাড়া, সরকার মামলায় জয়ী হলেও আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারবে না ("Personally I do not recommend it. The leaflet is nearly 1½ years old, and the prosecution, if successful, would give results incommensurate with the trouble and agitation which would necessarily arise.")। মামলা উপস্থাপিত হলে দেশে অনিবার্যভাবেই গণ্ডগোল ও আন্দোলন আরম্ভ হবে। অধিকন্তু, উপাধ্যায় প্রমুখ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিদান করা হলেও সেই দলের প্রধান নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে দুর্বল ও কাবু করা যাবে না। তিনি বর্তমানে যে কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তা আর কিছুদিন অব্যাহত থাকলে তাঁকে পরিণামে নিশ্চয়ই আইনের কবলে পতিত হতে হবে।

ষ্টিভেনসন্-মুরের পত্র পাবার পর সেইদিনই (২১শে জানুয়ারী, ১৯০৭) চীফ্ সেক্রেটারী কার্লাইল বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে পত্র মারফৎ সকল সংবাদ প্রদান করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁর মতে "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোনো শাস্তিমূলক কর্মনীতি গ্রহণ করা অনুচিত। প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেই ঐ অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করা হয়েছিল এবং ভারত সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত রাখাও ভাল। উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে হলে যে-কোনো সপ্তাহের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কপি ধরলেই চলবে ("If we want to prosecute I believe there is hardly a week in which the *Sandhya* does not publish some article which would justify our doing so.")। ছোটলাট এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলে (২২শে জানুয়ারী, ১৯০৭) বাংলা সরকারের তরফ থেকে

"সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে উদাসীনতা অবলম্বন করা হয়* (১৩)। তৎপর "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের সকল রিপোর্ট ও শেষ সিদ্ধান্ত ১৯০৭ সনের ১১ই মে শিলং-এ স্টুয়ার্ট বেকারের নিকট প্রেরণ করা হয় ও ১৭ই মে শিলং থেকে এর প্রাপ্তি স্বীকার পাঠানো হয়। এ ভাবেই "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গের উপর সরকারী তরফ থেকে যবনিকা টানা হলো।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, "সোনার বাংলা" পুস্তিকা স্বদেশী যুগে বিদেশী শাসকদের মনে কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আজ অর্ধ শতাব্দী পরে "সোনার বাংলা"র বিষয়বস্তু যতই মামুলি ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হোক্ না কেন, তৎকালে ঐ পুস্তিকার চিন্তারাশি বাঙালী কি ইংরেজ কেহই উপেক্ষা করতে পারে নি। উভয় বাংলার সর্বত্র ঐ পুস্তিকা যে পরিমাণে প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল অনেকটা অভাবনীয়। জনমানসে ঐ পুস্তিকা যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। এ কারণেই ঐ পুস্তিকার গোড়াঘর অনুসন্ধানে সেদিনকার বিদেশী শাসকবৃন্দের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, পুলিশ রিপোর্টে "সোনার বাংলা" পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হলেও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উপাধ্যায়কে ঐ পুস্তিকার লেখক বলে স্বীকার করেন না। তিনি আমাদের একাধিকবার বলেছেন যে, ঐ পুস্তিকার রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে দায়িত্ব ছিল বাংলার গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির। কলিকাতার বৈপ্লবিক সমিতির কর্মীরাই ঐ পুস্তিকা ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্টের সভানুষ্ঠানের সময় হাজারে হাজারে বিলি করেছিলেন। ভূপেনবাবু তাঁর পুস্তকেও লিখেছেন, "'সোনার বাংলা' নামক প্রথম ম্যানিফেষ্টো দেশে একটা চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। 'বঙ্গ-ভঙ্গ' প্রতিবাদে কলিকাতার যে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ-সভা টাউন হলে আহূত হইয়াছিল, তথায় এই পত্র বিস্তৃতভাবে বিতরিত হয়। এতদ্বারা সকলকার দৃষ্টি আকর্ষিত

*(১৩) *Ibid*, p. 41

হয় যে, দেশে একদল আছেন, যাঁহারা 'আবেদন ও নিবেদনের থালা' বহিতে প্রস্তুত নহেন"* (১৪)।

তৎকালীন বৈপ্লবিক সমিতির অন্যতম আদি কর্মী শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন যে, ঐ পুস্তকের লেখক কে ছিলেন তা তিনি জানেন না।

আবার 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুত সারদাচরণ সেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, "সোনার বাংলা" নামক পুস্তিকার লেখক উপাধ্যায় ছিলেন বলে তিনি কিছু জানেন না।

ভূপেনবাবু ও সারদাবাবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও "সোনার বাংলা" প্রসঙ্গে তাঁরা নিজ নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন বহু বৎসর পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। তাই তাঁদের মন্তব্যে কিছু ভুল-চুক হওয়া অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, পুলিশী রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল ঘটনার প্রায় সমসাময়িক কালেই, বহু তথ্য উদ্ঘাটন, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও ব্যাপক গবেষণার পরে। পুলিশ রিপোর্টে বিবৃত ঘটনাবলী সর্ব অবস্থায় সঠিক না হলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তাকে একেবারে অসত্য বলে অস্বীকার করা কঠিন।

* (১৪) "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" (কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১৪৬)

পরিশিষ্ট (গ)

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা*

"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি! যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরলপ্রাণ বন্ধন বিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে,
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!"

করতল চট্‌চটাধ্বনি-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু," "আমরা আর্য", "আমরা শ্রেষ্ঠ" এবঞ্জাতীয়ক গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন মস্তককণ্ডূয়নসূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।

* 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়), বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

কোন বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। "নেতি" "নেতি", ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ্-সংজ্ঞক পরিচয়। আবার বস্তুটি এইরূপ, ওইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপ পরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহাই অগ্রে বলা যাউক। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব শিবমন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধ্বাচার্য আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চমকারসাধক ছাগ-মহিষহননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠেনা। কিন্তু শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায়। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দু সংজ্ঞা অনেকদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহার-পান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুক্কুট-মাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহামাংস ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিধি-সাম্যের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আলম্বে হিন্দুর জাতীয়তা আলম্বিত আছে?

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আর্যবুদ্ধি বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোরবিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা যথাসময়ে পর্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বলে মানুষ নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরিবর্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী, প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক দর্শনচিন্তাবিধি একই। এই নির্ধারণ একান্ত শিরোধার্য। তথাপি হিন্দুচিন্তা প্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিধিগত পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া ঊর্ধ্বে অনন্তের দিকে উঠিল। মেঘাকাশ ছাড়াইয়া গ্রহতারক-মণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া ছায়াপথে পঁহুছিল। এই দিগ্বিহীন শূন্যে আনন্দের গভীরতায় ডুবিয়া বলিল, অনন্তপরমব্যোমে ভূমানন্দ, অসঙ্গানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিগ্‌-দিগন্তর পরিক্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য, কত সম্বন্ধ, কত কার্যকারণ-ঘটিত সুষমা দেখিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল—অনন্তের-অখণ্ডত্ব সমন্বয়ে, সংশ্লেষে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আর্যঋষি, দ্বিতীয়টি যুনানী বা গ্রীক দ্রষ্টা।

দুইটি মৎস্য জলধির স্বরূপনির্ণয়োদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা করিল। একটি ডুবিল, গভীরতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তুষ্ণীভূত। অপরটি পারদৃশ্বজ্ঞানলাভ বাসনায় ক্রমবন্ধন করিল। প্রখরস্রোতপ্রতিরোধী বলের সহিত উত্তালতরঙ্গাঘাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য জর্মণ।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া একতা দর্শন করা য়ুরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা বা অন্তর্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, সূর্যের স্বর্ণ-কবাট উদ্ঘাটন করিয়া সূর্যের সারভূত নিষ্কল বিরজ হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর য়ুরোপীয়েরা সূর্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুত্বনিহিত সুষমা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দুচিন্তার সহিত হিন্দুধর্মমত সমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রভাবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তা প্রণালী ধর্মমত হইতে পৃথক্। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে;—বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং—কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠচিন্তার গতি নির্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কলীকরালীমনোজবাপ্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন আহুতি ভোজন করিত তখন সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অগ্নিদেবকে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রমশালী প্রভঞ্জন ধরিত্রীকে আলোড়িত করিত তখন পবনদেবকে "শংনো বায়ু" বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন—এবম্প্রকারে স্তুতি করিতেন। গভীরনির্ঘোষী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচি-বিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়শক্তি ও চৈতন্যের

ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আর্য ঋষিদের আধ্যাত্মিক দর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্যকারণপরম্পরার সুদীঘ সূত্র ধরিয়া আদিকারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ কর্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণজলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে তপনতপ্ত জলকণার সমবায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য এই যাহা ছিল না তাহা কি রূপে হইল। মেঘ ছিল না মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ববর্তী জড়প্রক্রিয়া ছিল না হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাদ্ভাগে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসতের হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। যদি কোটি যোজন ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসৎ অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্যকারণশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী অব্যবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপ-সমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ সারতত্ত্ব বাস করে। ঋষিরা ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একেবারেই অদৃশ্য হিরণ্যগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে। আর্য একনিষ্ঠতায় আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অগ্নির দেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত হইল? বায়ু বরুণ তপনাদিদেবতা কর্তা হইয়াও কার্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্যেরও যে নাম কর্তারও সেই নাম। এই সমনামতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন আর্য ঋষিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না,

প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাহাদিগকে ঋষি বলা হইত। কর্তা কোন অপূর্ব মায়াশক্তি বলে কার্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্যকারণে ব্যবহারতঃ ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ তাহারা অভিন্ন—এই অভেদতত্ত্ব সমগ্র বেদগাথায় গীত হইয়াছে। কর্তা এবং কার্যের অভেদভাব, বিম্বরূপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাতি, অদ্বিতীয়ের মায়িক বহুত্ব, বৈদিক ঋষিদিগের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্তি লাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূততত্ত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব দ্বৈতান্ধকারাবৃত। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সদ্‌রূপী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমগ্রভূতপ্রপঞ্চকে সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুজাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুস্থানে সাংখ্য-দর্শনের সম্মান আছে বটে কিন্তু সাংখ্যমতের পোষক একবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একত্ব গভীরতর। ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা প্রভেদে বহু, সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীলীলাবহুত্বময়, মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘটশরাবদৃষ্টে বহু, সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকে না। ব্রহ্মের সত্তায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সম্বন্ধের প্রয়োজন

থাকে; যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সদ্বস্তুর পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণের যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম যতদূর হইবার সম্ভাবনা ততদূরই হওয়া ন্যায্য। ক্রমান্বয়ের স্থান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিজের কারণ হন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্বপরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টা-দ্বৈতে একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু ঋষিপ্রণোদিত হিন্দুর একমুখীন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে শতকরা দশজনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দুষ্প্রাপ্য।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর একনিষ্ঠতার চরম তৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু এক ভিন্ন পরমার্থতঃ দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী, আপ্তকাম, সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন কিন্তু সেই কারণবীজ তাঁহার সত্তাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব বা কারণত্ব একটা বাহুল্য বা ঐশ্বর্য মাত্র, তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্রষ্টৃত্বকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্তার উপচয় বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যতদিন ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয়, ততদিনে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত,

অলীক, সদ্রূপে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে ত অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মসত্ত্বা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গন্ধর্বনগরের ন্যায় এক অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই মায়া-শক্তি ব্রহ্মেতে অবস্থিত কিন্তু স্বরূপতঃ নহে। বাহুল্যভাবে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একই বহু হইয়াছে কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ। একের পরিবর্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাতি হয়। ঋষিরা যে অগ্নিদেবতাকে অগ্নি বলিতেন, কার্যের নামে কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই একত্বের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠচিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্বদর্শন, কর্তা এবং কার্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠচিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা! পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্যসন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের' অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে, হইবে, কিন্তু অস্থি-মজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

একনিষ্ঠার অভ্যুদয়-চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয়] বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষ সকল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানপ্রভাবে পরম-শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তার সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলণ্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে

না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

অনুষ্ঠান-পত্র*

বিশুদ্ধ ভাষায় বলে স্বরাজ্য—চলিত ভাষায়—স্বরাজ। অথবা—সে মহিম্নি রাজতে—নিজের মহিমায় যাহা বিরাজ করে—তাহাই স্বরাজ। স্বরাজের প্রতিষ্ঠা—মহিমায়।

মহিমা—মধুরিমা নহে। ছোট্ট ফুলটি মধুর বটে—মহৎ নয়। মহিমা—বিশালতাও নহে। দশকুশী মাঠ বিশাল বটে কিন্তু মহিমার স্ফূর্তি উহাতে দেখা যায় না।

মহিমা তবে কি। যে পূর্ণতা ভেদবিরোধে সমন্বয় ঘটায়—যে উদারতা বিষম-দ্বন্দ্বে সুষমা আনয়ন করে—তাহাই মহতের ভাব—মহিমা। একটি দৃষ্টান্ত লইলে এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে।

মহিমাকে যদি শরীরী দেখিতে চাও ত হিমাচলে চল। ঐ যে গিরিরাজ দেখিতেছ—উহা অমৃতের ভাণ্ডার—আবার মৃত্যুরও আধার। অমৃতবাহিনী নির্ঝরিণীকুলের শীতল সঞ্চারে ঐ বিপুল শিলাবক্ষ সদাই স্নিগ্ধ—মৃত্যুভয়-নিবারিণী শিবসোহাগিনীর কুলুকুলুধ্বনিতে ঐ হিমজটা চিরমুখর—মৃতসঞ্জীবন

* 'স্বরাজ' পত্রে ২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত।

বনস্পতিগণ ঐ পাষাণবিস্তারে সুপরিপুষ্ট। আবার ঐ হিমগিরিকূটে কালকূট ফুল ফুটে—অজগর গরল উদ্‌গার করে—বিষময় বনরাজি বিরাজ করে। ঐ উত্তুঙ্গ উত্তরাখণ্ড যোগিতপোধনদিগের আশ্রম—আবার হিংস্র ব্যাধ ও শ্বাপদ-কুলের বিহারভূমি। উহার মেখলায় মেঘের খেলা—শিরোদেশে তপনের জ্বালা। ঐ নগক্ষেত্রে কত সরোবর কত নির্ঝর—আবার নির্মম-কঠোর পাষাণ-প্রসর। কোথাও বা ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত—কোথাও বা মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল—আকম্পিত কুসুমবল্লরীর দোল। আবার উচ্চে হিমমণ্ডিত চূড়া-রাজির অভ্রভেদ—নীচে তমিস্রাবিজড়িত গুহা-গহ্বরের পাতালভেদ।

কি দুর্দম দ্বন্দ্ব—কি ভয়ঙ্কর ভেদ—কি বিচিত্র বিরোধ—কি বিশাল বৈষম্য—ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়। কিন্তু খণ্ডতার ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া বিয়োগদৃষ্টি বর্জন করিয়া যদি যোগদৃষ্টিতে দেখ—তাহা হইলে ঐ নগরাজের অচলপ্রতিষ্ঠা তোমার সম্মুখে উদিত হইবে—দেখিবে—উহার অচলতা—কালঝটিকার সকল চাঞ্চল্যকে অঙ্গীকার করিয়াছে—উহার উদারতা—সমস্ত দ্বন্দ্বের মিলন ঘটাইয়াছে—উহার পূর্ণতা—ভেদবহুলতায় অভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যে যোগ জানে—সে হিমালয়ের বিরোধ-বিষমতায় বিহ্বল হয় না—উহার অমৃত-পানে মদমত্ত হয় না—কালকূটের উগ্রতায় ভীত হয় না। হিমালয়ের যোগ-মহিমায় যদি একবার অধিষ্ঠিত হও ত তুমি উহার সকল ভেদ-বিরোধ আদরের সহিত স্বীকার করিবে—উহার অমৃত-গরল—উহার সরসতা-কঠোরতা—উহার শুভ্রতা-কৃষ্ণতা—সকল বৈষম্য তোমাকে এক অপার ভূমানন্দে মজাইবে। এইজন্যই হিমালয়কে যোগালয় বলে। ইহাই যোগেশ্বর মহেশ্বরের পীঠস্থান। আর তাঁহার যোগশক্তি যোগমায়া যে হিমাচল-কন্যা পার্বতী—সে তত্ত্ব আর বুঝাইতে হইবে না। যোগের পূর্ণতা শূন্যতা নহে। ভেদাভেদ-সমন্বয়-পটুতাই যোগ। যেখানে দ্বন্দ্ব-মিলনের যোগৈশ্বর্য সেইখানেই পরম মহিমা বিরাজ করে।

এই মহিমান্বিত গিরিরাজের ক্রোড়ে আর এক প্রতিষ্ঠা আছে। উহা অদ্বৈতরসসঞ্জীবিত বৈদিক-সংস্কার-পরিপুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমল-সুবাসিত অচল অটল হিন্দু-সমাজ।

দেখ একবার ঐ অদ্ভুত হিন্দু-প্রতিষ্ঠা। উহা নির্বাণসাগরোন্মুখী আর্যজ্ঞান-গঙ্গার বেদগাথাময় কুলুকুলুধ্বনিতে চিরগুঞ্জরিত—ভগবল্লীলারসে উহা মজ্জায় মজ্জায় অভিষিক্ত। আবার নাস্তিকবৌদ্ধ-বিষবৃক্ষ উহাতে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে—বেদবিরোধী সাম্প্রদায়িকেরা উহার অন্তরে অন্তরে প্রবৃত্তির বিষ ঢালিয়া দিয়াছে—পাষণ্ড হিংস্র বর্বর জাতিরা উহার তপোবনে কত ই না বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। কতই না বিপ্লব-ঝঞ্ঝার বিতাড়ন পরাজয়-পরাভবের উৎপীড়ন—উৎপাত-নিপাতের নিষ্পেষণ—ঐ সনাতন সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়াছে ও করিতেছে। ওদিকে আবার বৃন্দাবন-কুসুম-পরিমল-সেবিত মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোল উহার মর্মে মর্মে মধুমাধুরী ছড়াইতেছে। উহার শ্রীঅঙ্গে কত অভ্যুত্থান অভ্যুদয়ের মহিমা মাখানো রহিয়াছে—কতই না বিজয়-লেখা উহার সুবিস্তৃত ললাটে অঙ্কিত আছে। কতই না শৌর্যবীর্যের গৌরব-কিরীট উহার-শিরোদেশ শোভিত করিতেছে।

দেখ একবার—কি বিরোধ-বাহুল্য—কি বিচিত্র বৈষম্য—ঐ অদ্ভুত সমাজ-প্রতিষ্ঠায় বিজড়িত আছে। বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া বিয়োগদৃষ্টির বশীভূত হইয়া ঐ অচল অটল অমর হিন্দু সমাজকে যে দেখে—সে উহার অভেদ-মহিমা দেখিতে পায় না। কিন্তু যদি যোগদৃষ্টিতে দেখ তো বুঝিতে পারিবে যে উহার অচলতায় সকল বিপ্লবচাঞ্চল্য বিলীন হইবে—উহার উদারতায় সকল ভেদ-বিরোধের সমন্বয় হইবে—উহার পূর্ণতায় সমস্ত বৈষম্য সুষমায় পর্যবসিত হইবে—উহার যোগমহিমায় সকল সংঘর্ষ ভূমানন্দের শান্তিলাভ করিবে।

আজ কাল আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা চলিতেছে তাহাতে আমরা কেবলই বিয়োগশাস্ত্রে পটু হইতেছি। ফিরিঙ্গিরা আমাদের সনাতন সমাজতন্ত্র—আমাদের নিবৃত্তিময় সভ্যতা—খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের ছুরিকা দিয়া চিরিয়া চিরিয়া—আমাদের সমক্ষে ফেলিয়া দিতেছে—আর আমরা ভালমন্দ সমস্তই কুড়াইয়া কুড়াইয়া ঘরে তুলিয়া লইতেছি—আর ঐ সকল টুকরাগুলির সুখ্যাতি ও অখ্যাতির সমালোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই বিশ্লেষণের প্রকোপে আমরা ভালবাসা হারাইয়া ফেলিয়াছি—সেই সর্বময়

মহিমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আজ এত সমাজ-সংস্কারের আড়ম্বর ও কুলত্যাগের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

আমি জানি—আমার জননী তিলোত্তমার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দরী নহেন—মা জগল্লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বগুণশালিনী নহেন। কিন্তু তবু তিনি আমার মা। তাঁহার গুণও আছে দোষও আছে—কিন্তু মাতৃমহিমা ঐ দোষগুণের দ্বন্দ্বে এক অপূর্ব সুষমা বিস্তার করে। সেই সুষমা সেই শোভা আমায় আত্মহারা করে—আমাকে মায়ের চরণে বাঁধিয়া রাখে। যদি কোন পাষণ্ড ঐ মাতৃমহিমাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া সুকুমার বালকের কাছে মায়ের দোষগুলি ও গুণগুলি চিরিয়া দেখায় তাহা হইলে ভালবাসা প্রীতি পূজা ঐ কোমল হৃদয় হইতে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হয়। মায়ের সন্তান সমগ্র মাতৃবস্তুকে ভালবাসে—ভাল বলিয়া—বাসে—অঙ্গীকার করে—দোষগুণের সমালোচনা করে না। যখন তাহার প্রাণ মাতৃ-মহিমায় ভরপুর হয়—তখন সে দোষগুণ দেখে আর বলে—নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ। যদি বিমল-চন্দ্রিকা ও কলঙ্কলেখা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখ তাহা হইলে তুমি ও-হেন চাঁদেরও নিন্দুক হইয়া উঠিবে। কিন্তু যে চাঁদের মহিমাতে মজিয়াছে সেই চন্দ্রিকা ও লেখার মিলনতত্ত্ব বুঝে ও উহাতে ডুবে।

সর্বনাশ হইয়াছে। যোগদৃষ্টি হারাইয়া ভেদদ্বন্দ্বে আমরা অভিভূত হইয়াছি—নিজ মহিমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি—স্বরাজভ্রষ্ট হইয়াছি।

কি করিয়া সেই যোগদৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে—সেই অচল প্রতিষ্ঠ হিন্দু-সমাজের মহিমা আবার আমাদের প্রাণমনকে পূর্ণ করিবে। যতদিন না এই হিন্দু সমাজ-হিমাদ্রির গৌরবে আমরা মাতিয়া উঠি ততদিন আমাদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন সমস্তই মিথ্যা হইবে।

ঐ যোগদৃষ্টির পুনরুদ্ভাবন করিতে—ঐ অভেদ-মহিমার পুনরভ্যুদয় সাধিতে আমরা—স্বরাজ—পত্র প্রকাশ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র পত্রে—দেশের যত ঐশ্বর্য আছে—জয়-পরাজয়—মিলন-বিরোধ—স্বাদুতা-তিক্ততা — কাঠিন্য-কারুণ্য—বৈষম্য-সুষমা—অতীত ও বর্তমান যত গৌরব-বিকাশ আছে—সমস্তই আমরা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব। ঋষিজন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-সমাজের মহিমা

আমাদের দেবালয়ে চতুষ্পাঠীতে বাণিজ্যস্থানে গড়দুর্গে বিরাজিত রহিয়াছে—পাল-পার্বণে মেলায়-খেলায় আচার-ব্যবহারে কুল-গৌরবে বংশমর্যাদায় পিতৃপিতামহগণের কীর্তিতে সতীলক্ষ্মীদের আত্মত্যাগে উহা অনুস্যূত আছে। আমরা—স্বরাজ—পত্রে ঐ সমস্ত কীর্তি-কাহিনীর সমুজ্জ্বল ছবি আঁকিব। আমোদের জন্য নহে—কৌতূহল নিবারণের জন্য নহে—কিন্তু সেই অচল মহিমা উদ্ভাবন করিবার জন্যই আমাদের সকল যত্ন নিয়োজিত হইবে। আমরা যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বিচরণ করিতেছি। যদি এই সকল ঐশ্বর্যের সুবিন্যস্ত চিত্রণ আলোচনা করিয়া সেই সমন্বয়-সূত্র ধরিতে পারি—তাহা হইলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কালে কালে ভগবানের যত লীলা প্রকটিত হইয়াছে—সুখে দুঃখে প্রতিষ্ঠা-বিপ্লবে জয়-পরাজয়ে সম্পদে-বিপদে মিলন-সঙ্ঘর্ষে—উহা সমস্তই যোগের একতায় গাঁথিয়া লইব।—অভেদের ক্রোড়ে সকল বিরোধ মিটাইব—স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিব।

বিয়োগের আক্রমণ হইতে যদি বাঁচিতে চাও ত এক সুবিস্তৃত গণ্ডী আঁকিয়া নিজেদের একটি কোট প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই কোটে—সেই গণ্ডীর মাঝে স্বদেশী ঐশ্বর্য সাজাও——স্বদেশী শিক্ষা দীক্ষা বিধি-ব্যবস্থা বাণিজ্যব্যাপার প্রতিষ্ঠিত কর—স্বকীয় ধর্মকর্ম নিয়মসংযম অনুষ্ঠান কর—বিদেশীর বিশ্লেষ-ছুরিকার আঘাত প্রতিরোধ কর—অন্তমুখী হইয়া সাধন কর—দেখিবে শীঘ্রই সেই বিয়োগবিনাশী যোগমহিমা তোমার অন্তরকে পূর্ণ করিবে—তুমি সকল ভেদ-বাহুল্যের অধিকারী হইয়া মহীয়ান্ হইবে—ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে। তোমার অন্তর্মুখী সাধনার গুণে এক পাষণ্ডদলনী রিপুসংহারিণী শক্তি জাগরিত হইবে যাহার বলে যোগবিঘ্নকারীরা প্রতিহত হইবে ও দীনতা স্বীকার করিয়া যোগালয়ের প্রাঙ্গণ-কোণে আশ্রয় লাভ করিবে—যাহার দোর্দণ্ড তেজঃপ্রভাবে আর্যমহিমা আবার প্রকটিত হইবে।

এই—স্বরাজ—পত্র ঐ স্বদেশী গণ্ডী আঁকিয়া স্বদেশী কোট প্রস্তুত করিবার উপকরণ যোগাইবে—স্বদেশী ঐশ্বর্যের বিন্যাস করিয়া দিবে—বিদ্বেষীদের বিয়োগ-প্রভাব খর্ব করিবে—অন্তর্মুখী সাধনকল্পে সহায়তা করিবে—স্বরাজ প্রতিষ্ঠা-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিবে।

স্বরাজ পত্রের বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাতে ধর্মবীর কর্মবীর রণবীর-দিগের সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হইবে। আর তাঁহাদের যত কীর্তি আছে তাহাও চিত্রিত হইবে। দেবমন্দির তীর্থস্থান পীঠস্থান বিদ্যাস্থান শিল্প-বাণিজ্যস্থান—যুদ্ধক্ষেত্র গড়দুর্গ সমস্তেরই আলেখ্য অঙ্কিত হইবে। আর চিত্রিত বিষয়গুলির ইতিহাসও দেওয়া হইবে। ইহাতে দেশের সংবাদ ও দেশের কথার সমালোচনাও থাকিবে।

আমরা এই স্বরাজ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদের ধনবল জনবল বিদ্যাবল কিছুই নাই। কেবল মায়ের প্রসাদ ও মায়ের সন্তানদের আনুকূল্যই—আমাদের ভরসা।

আমাদের স্বরাজনীতি*

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে রাজনীতির উদ্ভব—। রাজা না থাকিলে রাজনীতি থাকিতে পারে না। আমাদের এখন কোন রাজা নাই। তাই আমাদের রাজনীতিও নাই। কেন—ইংরেজ ত আমাদের রাজা। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই ইংরেজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। যথাবিধি অভিষিক্ত না হইলে হিন্দুস্থানে কেহ কখনও রাজা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপই যদি হয় ত—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—এই প্রবচনের অর্থ কি। ব্রাহ্মণরাও ঐ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানের পক্ষে দিল্লীশ্বর ভারতের ঈশ্বর ছিলেন বটে—কিন্তু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রজাবর্গ দিল্লীশ্বরকে রাজা বলিয়া কখনই অঙ্গীকার করেন নাই। বা শব্দের অর্থ হয়-নয়। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—বলিলে

* 'স্বরাজ' পত্রে ২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

বুঝায়—হয় দিল্লীশ্বর—নয় জগদীশ্বর। ঐ দুইটি বস্তু এক হইতে পারে না। যদি দিল্লীশ্বরকে গ্রহণ কর ত জগদীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে—আর যদি জগদীশ্বরকে গ্রহণ কর ত দিল্লীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে। দিল্লীশ্বর যদি ভারতেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেন তাহা হইলে মোগল শাসনের দুই শত বৎসর না যাইতে যাইতেই শিবাজী মহারাজ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না।

এইরূপ যদি স্বীকার করা যায় ত ভেদবাদ আসিয়া পড়ে না কি—ভগবল্লীলায় ভঙ্গদোষ আসে না কি।—না—।

যখন কর্মদোষে সমাজ দুষ্ট হয়—যখন ভোগৈশ্বর্যে প্রজাকুল অবসন্ন হইয়া পড়ে—তখন রাজশ্রী অন্তর্হিতা হন—ভগবানের অংশে আর প্রজারঞ্জন রাজা গঠিত হন না। তথাপি ঈশ্বরের লীলা প্রকাশের বিঘ্ন ঘটে না। ঈশ্বর তখন রাজা না হইয়া শাসনকর্তার রূপ ধরিয়া প্রকট হন—চামর ছাড়িয়া কেবল দণ্ড লইয়া কর্মদোষদুষ্ট সমাজকে শাসন করেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর দেন। ঐ দুঃসময়ে শাস্তা থাকে দণ্ডদাতা থাকে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যময়ী রাজলক্ষ্মী মায়ের লুক্কায়িত শ্রীচরণপল্লবে আবৃত থাকেন—বাহিরে কেবল অসি ঝক্ ঝক্ করে—লোলজিহ্বা লক্ লক্ করে—মুণ্ডমালা ঝলমল করে! যদি তুমি ৺কালীঘাটে যাও ত মায়ের এই মূর্তি দেখিতে পাইবে। মা—তাঁর লুকানো রাঙ্গা চরণে স্বরাজ-শ্রী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন—কালী-করালী রূপে বিরাজ করিতেছেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ঠাকুরের লীলা স্বীকার করিতে হইবে। কখনও তিনি প্রজাপালক রাজ-রাজেশ্বর—কখনও বা দণ্ডদায়ক চণ্ডেশ্বর।

আমরা তাঁহার লীলারঙ্গ বুঝিয়া—যেন তাঁহাকে স্বীকার করি। যদি তিনি তস্কররূপে আমার গৃহে লীলা করিতে আসেন ত আমি তস্কররূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করিব—উদ্ধারকর্তা বলিয়া স্বীকার করিব না—আর তাঁহার পূজার জন্য চপেটাঘাত ও তাড়নলীলার প্রকৃষ্ট আয়োজন করিব। সেইরূপ শাসনকর্তাকে অভিষিক্ত রাজা বলিয়া বরণ করিও না। দিল্লীশ্বর রাজরাজেশ্বর নহেন—কেবল কর্মদোষের শাস্তি-বিধান করিতে দণ্ডধর

হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর—রাজা বলিয়া কখনই গৃহীত হন নাই—তাই ত স্বরাজ-মহারাষ্ট্রের অত শীঘ্র উদ্ভাবন হইয়াছিল।

ইংরেজ-শাসনকে আমরা ঠিক ঐ ভাবে গ্রহণ করি। ইংরেজকে আমরা রাজা বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারি না—স্বীকার করিলে ধর্মহানি হইবে। ইংরেজ যথাবিধি অভিষিক্ত রাজা নহে—রঞ্জন-গুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই—হইতেও পারে না। শাসন করিতে—দণ্ড দিতে—কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ—বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ গভীর হইবে ঘন হইবে—তত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্ত্তী হইবে।

এত দিন আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম—মনে করিতাম যে ইংরেজ আমাদের রাজা—আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে উহারা আসিয়াছে। এখন কিন্তু মোহ ঘুচিয়াছে—বুঝিতে পারিয়াছি যে ফিরিঙ্গি ইংরেজ শাসনদণ্ডের তীব্রতায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে—কর্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে উন্মুখ করিতে—এই পুণ্যভূমি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

এস—এই গূঢ় ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা স্বরাজের উদ্ভাবনা করিতে যত্ন করি। স্থানে স্থানে স্বদেশী আবাস স্বদেশী আস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তথায় আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের শাসনতন্ত্র আমাদের বিধিব্যবস্থা আমাদের বানিজ্যব্যাপার চলিবে। আমাদের প্রহরীপাহারা সেই স্বরাজ-আবাস সকলকে রক্ষা করিবে। ইংরেজের শাসনদণ্ড অতিক্রম না করিয়া আমরা সেই পুণ্য আস্থানে স্বরাজ-নীতি পালন করিব—ফিরিঙ্গি-সংস্রব-দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। সেখানে ফিরিঙ্গি ও ফিরিঙ্গিয়ানাকে আসিতে দিব না—যদি আসে ত ঐ স্বরাজগড়ের নাচদুয়ারে স্থান পাইবে।

ভগবান্ করুন যেন এই স্বরাজ-নীতি পালনে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু যদি কেহ বিঘ্ন ঘটায় ত বিঘ্ননাশিনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে—মায়ের অসি ঝলসিবে—তাণ্ডার রণনৃত্যে স্বরাজ-আবাস মাতিয়া উঠিবে।

মা গো—কবে তোর লুকানো চরণকমল দেখা যাইবে—আর সেই রাঙ্গা চরণের জ্যোতিতে স্বরাজ-শ্রী ঝলসিয়া উঠিবে।

বুঝায়—হয় দিল্লীশ্বর—নয় জগদীশ্বর। ঐ দুইটি বস্তু এক হইতে পারে না। যদি দিল্লীশ্বরকে গ্রহণ কর ত জগদীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে—আর যদি জগদীশ্বরকে গ্রহণ কর ত দিল্লীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে। দিল্লীশ্বর যদি ভারতেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেন তাহা হইলে মোগল শাসনের দুই শত বৎসর না যাইতে যাইতেই শিবাজী মহারাজ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না।

এইরূপ যদি স্বীকার করা যায় ত ভেদবাদ আসিয়া পড়ে না কি—ভগবল্লীলায় ভঙ্গদোষ আসে না কি।—না—।

যখন কর্মদোষে সমাজ দুষ্ট হয়—যখন ভোগৈশ্বর্যে প্রজাকুল অবসন্ন হইয়া পড়ে—তখন রাজশ্রী অন্তর্হিতা হন—ভগবানের অংশে আর প্রজারঞ্জন রাজা গঠিত হন না। তথাপি ঈশ্বরের লীলা প্রকাশের বিঘ্ন ঘটে না। ঈশ্বর তখন রাজা না হইয়া শাসনকর্তার রূপ ধরিয়া প্রকট হন—চামর ছাড়িয়া কেবল দণ্ড লইয়া কর্মদোষদুষ্ট সমাজকে শাসন করেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর দেন। ঐ দুঃসময়ে শাস্তা থাকে দণ্ডদাতা থাকে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যময়ী রাজলক্ষ্মী মায়ের লুক্কায়িত শ্রীচরণপল্লবে আবৃত থাকেন—বাহিরে কেবল অসি ঝক্ ঝক্ করে—লোলজিহ্বা লক্ লক্ করে—মুণ্ডমালা ঝলমল করে! যদি তুমি ৺কালীঘাটে যাও ত মায়ের এই মূর্তি দেখিতে পাইবে। মা—তাঁর লুকানো রাঙ্গা চরণে স্বরাজ-শ্রী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন—কালী-করালী রূপে বিরাজ করিতেছেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ঠাকুরের লীলা স্বীকার করিতে হইবে। কখনও তিনি প্রজাপালক রাজ-রাজেশ্বর—কখনও বা দণ্ডদায়ক চণ্ডেশ্বর।

আমরা তাঁহার লীলারঙ্গ বুঝিয়া—যেন তাঁহাকে স্বীকার করি। যদি তিনি তস্কররূপে আমার গৃহে লীলা করিতে আসেন ত আমি তস্কররূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করিব—উদ্ধারকর্তা বলিয়া স্বীকার করিব না—আর তাঁহার পূজার জন্য চপেটাঘাত ও তাড়নলীলার প্রকৃষ্ট আয়োজন করিব। সেইরূপ শাসনকর্তাকে অভিষিক্ত রাজা বলিয়া বরণ করিও না। দিল্লীশ্বর রাজরাজেশ্বর নহেন—কেবল কর্মদোষের শাস্তি-বিধান করিতে দণ্ডধর

হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর—রাজা বলিয়া কখনই গৃহীত হন নাই—তাই ত স্বরাজ-মহারাষ্ট্রের অত শীঘ্র উদ্ভাবন হইয়াছিল।

ইংরেজ-শাসনকে আমরা ঠিক ঐ ভাবে গ্রহণ করি। ইংরেজকে আমরা রাজা বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারি না—স্বীকার করিলে ধর্মহানি হইবে। ইংরেজ যথাবিধি অভিষিক্ত রাজা নহে—রঞ্জন-গুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই—হইতেও পারে না। শাসন করিতে—দণ্ড দিতে—কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ—বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ গভীর হইবে ঘন হইবে—তত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্ত্তী হইবে।

এত দিন আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম—মনে করিতাম যে ইংরেজ আমাদের রাজা—আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে উহারা আসিয়াছে। এখন কিন্তু মোহ ঘুচিয়াছে—বুঝিতে পারিয়াছি যে ফিরিঙ্গি ইংরেজ শাসনদণ্ডের তীব্রতায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে—কর্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে উন্মুখ করিতে—এই পুণ্যভূমি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

এস—এই গূঢ় ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা স্বরাজের উদ্ভাবনা করিতে যত্ন করি। স্থানে স্থানে স্বদেশী আবাস স্বদেশী আস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তথায় আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের শাসনতন্ত্র আমাদের বিধিব্যবস্থা আমাদের বানিজ্যব্যাপার চলিবে। আমাদের প্রহরীপাহারা সেই স্বরাজ-আবাস সকলকে রক্ষা করিবে। ইংরেজের শাসনদণ্ড অতিক্রম না করিয়া আমরা সেই পুণ্য আস্থানে স্বরাজ-নীতি পালন করিব—ফিরিঙ্গি-সংস্রব-দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। সেখানে ফিরিঙ্গি ও ফিরিঙ্গিয়ানাকে আসিতে দিব না—যদি আসে ত ঐ স্বরাজগড়ের নাচদুয়ারে স্থান পাইবে।

ভগবান্ করুন যেন এই স্বরাজ-নীতি পালনে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু যদি কেহ বিঘ্ন ঘটায় ত বিঘ্ননাশিনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে—মায়ের অসি ঝলসিবে—তাণ্ডার রণনৃত্যে স্বরাজ-আবাস মাতিয়া উঠিবে।

মা গো—কবে তোর লুকানো চরণকমল দেখা যাইবে—আর সেই রাঙ্গা চরণের জ্যোতিতে স্বরাজ-শ্রী ঝলসিয়া উঠিবে।

3 Jan 1906

বহরমপুরের বৈঠক ও আত্মরক্ষা*

বহরমপুরের বৈঠকে বঙ্গদেশের চারিদিক হইতে ভদ্র জন-সমাগম হইবে—বহরমপুর আনন্দপুরে পরিণত হইবে।

ফিরিঙ্গি একটা কৃত্রিম দাগ কাটিয়া বঙ্গদেশকে দু'টুকরা করিতে চায়। কে বা ঐ দাগকে মানে। ঐ দাগকে পদদলিত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে—অপূর্ব মিলন সঙ্ঘটিত হইবে।

ফিরিঙ্গির বঙ্গ-ভঙ্গের পর প্রথম মিলন বরিশালে হয়। কিন্তু সে মিলনে ফিরিঙ্গিরা বাধা দেয়। এইবার মিলন গাঢ় ও স্থায়ী হইবে—কার সাধ্য বিঘ্ন ঘটায়।

এই আনন্দের মিলনে একটি নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইবে। প্রস্তাবটি কেবল কথার নয়—কাজের। এবার স্বদেশী থানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা চাই।

স্বদেশী থানার কি প্রয়োজন। ফিরিঙ্গিরা ত আমাদের রক্ষার ভার লইয়াছে। উহারাই ত আমাদের ধন প্রাণ মান রক্ষা করে। আর আমরা কেবল খাজনা দিয়াই খালাস। তবে আর থানা স্থাপনা করিয়া কি লাভ। সুবিধা ছাড়িয়া কুবিধায় পড়িতে যাওয়া কেন?

মানব সমাজের প্রথম ও মুখ্য অধিকার—আত্মরক্ষা। যদি এই অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটে তবে সমাজ বিনষ্ট হয়। আত্মা প্রজাতে ব্যষ্টিরূপে ও রাজাতে সমষ্টিরূপে প্রকাশিত। তাই লোকরক্ষার ভার সমাজের আত্ম-সমষ্টি-স্বরূপ রাজার উপরই আরোপিত হয়। তথাপি ব্যক্তিগত ব্যষ্টি আত্মাতেও এই অধিকার ন্যস্ত থাকে। সমষ্টির অধিকার স্বভাবতঃই ব্যষ্টিতে বিরাজ করে। যে সমাজে রাজ-অধিকার প্রজা-সমষ্টিগত নহে—ব্যক্তিসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন—সে সমাজের প্রতিষ্ঠা নাই—উহা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজশক্তি যদি প্রজাশক্তিকে অন্তর্ভূত না করিয়া স্থিতি করে তবে ঐ স্থিতি—ভঙ্গেরই কারণ

* 'স্বরাজ' পত্রে ১০ই চৈত্র, ১৩১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

হয়। রাজা যদি প্রজাকুলের আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনাত্ম হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত আত্মশক্তির ঐ অনাত্মের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া নূতন এক আত্মীয় রাজশক্তি উদ্ভাবন করে ও অনাত্মবিষয়ের উৎপীড়ন হইতে সমাজকে রক্ষা করে। মুখ্যতঃ—সমাজ-সমষ্টির আত্মরক্ষা ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বারাই সাধিত হয়। রাজা স্বদেশী হইলেও এই অনাত্মতা দোষ আসিয়া লোকসমাজের হানি করিতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য—আমাদের এই বিদেশী শাসনকর্তারা কি এই ভারতীয় লোকসমাজের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কখনই না। বিদেশী শাসনকর্তা রাজা বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ। বিদেশীয় শক্তি প্রকৃতি-রঞ্জন করিতে পারে না—কেবল কর্মদোষের দণ্ডবিধান করে—অনাত্মবিষয়ের ন্যায় আত্মবস্তুকে আচ্ছন্ন ও অসাড় করিয়া রাখে। যাহা বাহ্য ও পর তাহা সমাজের আত্ম-সমষ্টি হইতে পারে না। বহিরাগত অনাত্মশক্তি সমাজনিহিত প্রজাশক্তিকে স্বীকার করিয়া—আত্মীয় করিয়া—প্রভুত্ব করিতে অসমর্থ।

রাজা স্বদেশী হইলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা চাই—কারণ ঐ ব্যক্তিগত অধিকার লইয়াই রাজ-অধিকার গঠিত হয়। যখন স্বদেশীরাজ্যেই এই ব্যবস্থা তখন অনাত্ম সমাজ-বহির্ভূত বিদেশীয় শক্তির শাসনকালে এই ব্যক্তিগত অধিকারের অনুশীলন যে একান্ত অপরিহার্য তাহা আর যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। এইবারকার বহরমপুর বৈঠকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, ফিরিঙ্গি শাসন-শক্তি কখনই আমাদের আত্মীয় হইতে পারে না। তজ্জন্য ঐ আগন্তুকদের উপর লোকরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হইয়া থাকিলে সমাজভঙ্গের আশু সম্ভাবনা। আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা ও ব্যস্ত বিপর্যস্ত করাই অনাত্মের স্বভাব। দেখ—অনাত্ম ফিরিঙ্গি-শক্তি কেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া প্রথমে আমাদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিল—পরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কুমিল্লার ব্যাপারে ফিরিঙ্গি শক্তির প্রকৃতি অত্যন্ত মূঢ়েরও নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তারক্তি কাণ্ডে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে

যে, ফিরিঙ্গির প্রভুত্ব আমাদের সমাজকে তুচ্ছ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন যদি আমরা আত্মরক্ষার অধিকার শীঘ্র শীঘ্র প্রতিষ্ঠা না করি তাহা হইলে সমাজের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িবে।

আমরা যতদূর ভাবিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছোট বড় ঘাঁটি ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একশত ঘর অধিবাসীর হিসাবে পাঁচ জন করিয়া পাইক ও এক জন করিয়া নায়ক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাহাল রাখা উচিত। দশ দশটি ঘাঁটির উপর এক একটি করিয়া ছোট থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ঐ ছোট ছোট থানায় দশ জন পাইক—একজন নায়ক ও একজন অধিনায়ক থাকিবে। আর প্রত্যেক জেলার সদরে একটি করিয়া বড় থানা স্থাপনা করিতে হইবে। বড় বড় থানায় পঁচিশ জন পাইক—একজন নায়ক—একজন অধিনায়ক ও একজন অধিপতি নিযুক্ত থাকিবেন। এই অধিপতির অধীনে জেলার ছোট ছোট থানা ও ঘাঁটিগুলি পরিচালিত হইবে। নিম্নশ্রেণী হইতে পাইক সংগ্রহ করিতে হইবে, আর উচ্চশ্রেণীর মধ্য হইতে নায়ক, অধিনায়ক ও অধিপতি নির্বাচিত হইবে। জেলায় জেলায় যে সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে সেই সমিতির দ্বারা ঐ থানা ও ঘাঁটিগুলি নিয়মিত ও প্রতিপালিত হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। আমরা ত লুকাইবার কোন কারণ দেখি না। আইন বা বিধি ভাঙ্গিবার জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোকরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উহার আয়োজন। তাই ইহার লুক্কায়িত অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। হইতে পারে যে ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই উদ্যোগে বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় হয় ততই মঙ্গল—দেশের লোকের চৈতন্য হইবে—সাড় হইবে—শক্তি বাড়িবে।

বহরমপুরের বৈঠকে যেন এই আত্মরক্ষার বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা হয় ও যাহাতে এই মুখ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য একটি প্রণালী স্থির করা চাই। এই আত্মরক্ষার উদ্যোগ ব্যয়সাপেক্ষ ও শিক্ষাসাপেক্ষ। পাইক নায়ক অধিনায়ক ও অধিপতিদের বিশেষভাবে থানার কার্যে শিক্ষিত

করা আবশ্যক। ঘাঁটি ও থানাগুলির প্রতিপালনের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হইবে। কি প্রকারে ঐ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে—এই বৈঠকে তাহারও মীমাংসা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত। এখন আর ভয় করিলে চলিবে না। উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—আত্মানাত্মবিবেকে প্রবুদ্ধ হও। এখন সকল কাজ ফেলিয়া যাহা আত্মীয় তাহাকে অনাত্মের নিগ্রহ হইতে রক্ষা কর—তবে মুক্তিলাভ হইবে—স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বেদনার সাড়া*

যখন শিবাজী মহারাজ তাঁহার জয়ভেরী বাজাইলেন তখন ভারতবাসী জাগে নাই—সাড়া দেয় নাই। তিনি জনকয়েক পাহাড়িয়া অনুচর লইয়া তাঁহার মহারাষ্ট্র স্থাপন করিলেন কিন্তু রাজপুত পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী—কেহই তাঁহার বিজয়সংবাদে শঙ্খধ্বনি করিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা বলবাহিনী ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল—বড় বড় রাজা নবাব ফৌজদারকে যুদ্ধে পরাভব করিল—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে চৌথ আদায় করিয়া পেশোয়ার কোষাগার পূর্ণ করিতে লাগিল—এমন কি শেষে দিল্লী অধিকার করিয়া বাদশাহকে করতলগ্রস্ত করিল। আবার এই বিশাল মহারাষ্ট্র তরু হইতে কত না বড় বড় শাখা-রাজ্যের অভ্যুদয় হইল—ভোঁসলে সিন্ধিয়া হোল্‌কার গাইকবাড় প্রভৃতি। এরূপ বিক্রম-বিস্তার অতি অল্প দেখা যায়। তথাপি এই পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র স্থায়ী হইল না।

কারণ কি। শিবাজীর ডাকে কেহ সাড়া দিল না। তাঁহার পরবর্তী

* 'স্বরাজ' পত্রে ৮ই বৈশাখ, ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত

সেনাদল যেরূপ মোগল পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল সেইরূপ স্বদেশবাসীদেরও সহিত তাহাদের শত্রুতা করিতে হইয়াছিল।

মারাঠা অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল কিন্তু উত্তর ও পূর্ব হিন্দুস্থানবাসীদের তাহাতে সাড় হইল না। মহরাষ্ট্রীয় পতাকাকে কোথায় হিন্দুরাজলক্ষ্মীর ধ্বজা বলিয়া আলিঙ্গন করিবে—না বর্গীদের লুণ্ঠন-ঝণ্ডা মনে করিয়া ভারতসন্তানেরাই উহাকে ভূমিতে লুটাইবার চেষ্টা করিল। যদি শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ও পতনের কথা পর্যালোচনা করা যায় ত দেখা যাইবে যে সমগ্র ভারত-বাসীর হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই বলিয়া উহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। শীতপ্রধান দেশে লতাগুল্মের মূলগুলি তুষারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। নব বসন্তের মলয়-ঝঙ্কারে তাহাদের অন্তরে অন্তরে সাড় হয় ও নবোদ্‌গমের শ্যামল শ্রী বিস্তার করিয়া মধুসমাগমকে সার্থক করে। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হয় যে মলয় বায়ু স্বনিয়া স্বনিয়া চলিয়া যায়—কূজন গুঞ্জনেও দিক্ মুখর হয়—কিন্তু তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতি সাড়া দেয় না—কেবল মাঝে মাঝে দু-দশটা তরু-বল্লরী সায় দেয়। তখন লোকে বলে যে বসন্ত কিছু অকালে আসিয়াছে। মারাঠা অভ্যুত্থানও সেইরূপ অকালে হইয়াছিল। দেশের সাড়া পাওয়া যায় নাই। কেবল সেই দক্ষিণে সহ্যাদ্রির কোলে সাড় হইয়াছিল। যদি শিবাজীর ডাকে রাজপুত পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী সকলে জাগিত তাহা হইলে কি আজ ভারতের এই দুর্দশা হইত।

শিবাজীর পরে আর একবার ডাক আসে। যখন ফিরিঙ্গিরা শঠতা ও ষড়যন্ত্র করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করে তখন সন্তান সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। ইঁহারা সন্ন্যাসী—বিন্ধ্যাচলে ইঁহাদের গুরুস্থান—মন্ত্র বন্দে মাতরম্। ইঁহাদের প্রতাপে বিদেশীরা অনেকবার পরাভূত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইঁহারা স্বরাজ-স্থাপনের উদ্যোগ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ডাকে বাঙ্গালীর চৈতন্য হইল না। বাঙ্গালীরা উল্টা ঐ মায়ের সন্তানদের ফিরিঙ্গির হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতায় সন্তানেরা মারা পড়েন।

আরও একবার ডাক আসে। সিপাহীদের শেষ আহ্বান। তোমরা বলিবে—উহা বিদ্রোহ—উহা মায়ের ডাক নহে। উহাকে বিদ্রোহ বল বা বিদেশীর বিরুদ্ধে দ্রোহ বল—তোমার যাহা ইচ্ছা, কিন্তু উহা যে স্বাধীন হইবার একটি বিপুল চেষ্টা—তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। ঐ সিপাহী যুদ্ধের সিংহনিনাদেও আমাদের দেশ জাগে নাই।

এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে দেশ না জাগিলে—দেশ না সাড়া দিলে—বীরপুরুষদের আহ্বান বা অন্ত কোন প্রকার আয়োজন—যতই উহা প্রকাণ্ড হইক না—সার্থক হইবে না। যাহাতে দেশ জাগে—দেশের সাড় হয়—স্বরাজ-পতাকা উড়িবামাত্র ভারতের সকল প্রদেশ হইতে তুরীভেরী বাজিয়া উঠে—তাহারই আয়োজন বিধান এইবার হইতেছে।

এক পরাক্রান্ত বিদেশী শাসন সমগ্র ভারতকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এই বাঁধনের পীড়া সমস্ত ভারতবাসী যুগপৎ ভোগ করিতেছে। পূর্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের অনেক মিলন-ভূমি ছিল—তীর্থস্থান অধ্যয়ন-স্থান বাণিজ্যস্থান—কিন্তু এমন ব্যথার মিলন অন্য কোনও সময় ছিল না মুসলমানদের শাসনকালে অত্যাচার উৎপীড়ন হইত না যে তাহা নহে। কিন্তু স্থবাদারেরা এক একজন প্রায় স্বাধীন নবাব ছিলেন আর দেশীয় রাজা ও জায়গীরদারেরা স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। তাই এক জায়গায় উৎপীড়ন হইলে সকল জায়গায় তাহার বেদনা অনুভূত হইত না। আবার যখন সৌরাষ্ট্রে অত্যাচার হইতেছে তখন হয় ত বঙ্গে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছে। ফিরিঙ্গির আমলে কিন্তু একটানা শোষণ-মোষণ। প্রথমতঃ ফিরিঙ্গিরা ভারতবাসীদের এক অসভ্য অনুপযুক্ত হীন জাতি বলিয়া মনে করে। ভারতবাসীরা যে তাহাদের নীচে থাকিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর তাহাদের শাসন-নীতি গঠিত। ঐ নীতির গুণে ভারতের সর্বত্র পদদলন ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। শাঁসটুকু ভোজন খোসাটুকু বিতরণ—মজলিস করিয়া ভারতের রাজস্ব আত্মনি নিবেদন—আদালত করিয়া খুনকে

প্লীহা-ফাটানো ভাষণ—আইন করিয়া স্বদেশী বীরচূড়ামণিদের পেষণ—এইরূপ বিধিবিধানের নিয়োগ ভারতের সর্বস্থানেই হইতেছে। কোন সভ্যতার উচ্চতম-শিখরারূঢ় সমাজ অর্ধসভ্য অর্ধবর্বর প্রবৃত্তিপ্রবণ জাতির অধীনে আসিলে উহার যে উৎকট ক্লেশ হয়—তাহাই আমাদের হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় যে ক্লেশটা সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে ক্রমশঃ অসাড় দেশের সাড় হইতেছে। আজ ঐ সুদূর পঞ্জাবে একজন সামান্য সম্পাদকের হাতে হাতকড়ি পড়িয়াছে—আর এই সুদূর বঙ্গদেশের মর্মে মর্মে উহা ব্যথা দিতেছে। তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহার খালসা ঝণ্ডা উড়াইছিলেন—তখনও এমন সাড় হয় নাই। বিজেতারা—তাঁহাদের আচরণের দ্বারা যতই দেখাইয়া দিতেছে যে আমরা পরাধীন পদদলিত ততই আমাদেরই আত্ম-সংজ্ঞা খরতর হইতেছে। এইরূপ যখন আমাদের অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথার মট্‌মটানি ধরিবে—যখন সমস্ত ভারত এক বেদনা-সূত্রে গ্রথিত হইবে—কোন এক প্রান্ত হইতে ডাক পড়িলে সারা মুলুকে সাড়া পড়িবে—তখনই মহাপুরুষ তাঁহার বিজয়ভেরী বাজাইবেন আর চারিদিকে কোলাহল ছুটাছুটি পড়িয়া যাইবে—কেহই আর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিবে না। পুরানো বিধানে আগে মহাপুরুষ আসিয়া ডাকিতেন আর কেহ বা সাড়া দিত—কেহ বা দিত না—এখন নূতন স্বরাজ-বিধানে আগে দেশে বেদনাময়ী সাড়ার ব্যবস্থা হইবে—তবে স্বরাজ-স্থাপনের জন্য বিপুল আয়োজন হইবে। আগে বলিতাম—এখান থেকে মারিলাম সাড়া—সাড়া গেল সেই বামুন-পাড়া। এখন বলিতে হইবে—এখান থেকে মারিলাম সাড়া—সাড়া গেল সেই মারাঠা পাড়া!

জাগুক ব্যথা—উঠুক বেদনা—তাহা হইলে দেশ জাগিবে—মায়ের ডাক শুনিয়া আর অসাড় হইয়া থাকিবে না।

স্বরাজ-গড়*

আমার ঘর নাই—পুত্রকলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃতস্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম—কথাটি ভুলিয়া যাইতে—কিন্তু যত ভুলিতে যাই তত ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

কথাটি কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।—

নির্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম—আসিয়া দেখি যে আমারি মত দু-চারি জন ভবঘুরে লোক ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল।

জানি না—ভগবানের কি উদ্দেশ্য। এই সুসমাচারের সাক্ষ্য আজ আমি দিব। আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবনস্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জনসমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। মাদৃশ হীনজনের নিকট এত বড় কথার অবতারণা কেন হইল। কিন্তু যখন দেখিলাম—যে আমি একেলা নই—আরও আমার মত পাগল আছে—তখন বুঝিলাম—আর এড়াইবার উপায় নাই—এখন দল বাঁধিয়া মুক্তির রোল তুলিতে হইবে—যাহা গোপনে শুনিয়াছি তাহা ভেরী বাজাইয়া বলিতে হইবে। আরও যখন দেখিলাম—স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপিয়া উঠিতেছে—মুক্তির

*'স্বরাজ' পত্রে ২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত

সমাচারে শত শত নরনারী সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে—তখন বুঝিলাম —উদ্ধারের দিন সন্নিকট।

আবার যখন দেখিলাম—আমাদের ফিরিঙ্গি-ভাবমুগ্ধ বাবুদের দল মুক্তির সংবাদ সহিতে না পারিয়া আমাদের কত কুৎসা রটাইতে লাগিল—নূতন ভাবের ভাবুকদের কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল —তখনই রঙ্গ বাধিল—রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ওরা যতই নিন্দা করে—তাড়না করে—ততই প্রাণে প্রাণে সিংহবল জাগিয়া উঠে—প্রাণ যায় সেও স্বীকার—স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত-আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ কি বাতুলের কথা। তোমরা আসিয়া দেখ—আমার মর্মস্থল চিরিয়া দেখ—মর্মে মর্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঐ কথাটি লেখা রহিয়াছে—স্বাধীনতা—মুক্তি—স্বরাজ।

তোমরা অত ভয় পাও কেন। তোমাদের প্রাণটা একবার খুলিয়া দেখ দেখি। দেখিতে পাইবে যে তোমাদেরও প্রাণে ঐ মুক্তি-সঙ্গীত বাজিতেছে। তোমরা যে মায়ের ছেলে—ফিরিঙ্গিকে অত ভয় কর কেন। কপটতা ছাড়িয়া দিয়া—এস সকলে একবার সপ্ত-কোটি কণ্ঠে বলি—বন্দে মাতরম্—মায়ের ছেলে হইব—স্বাধীন হইব—স্বরাজ স্থাপন করিব।

আমি নর্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজ -গড় নির্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড়—যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয়-সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্যশ্যামলতায় পূর্ণশ্রী হইবে।

এস এস সবে—যাহারা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ—পুরানো বাঁধন ছাড়িয়া সেই স্বরাজ-গড়ের প্রজা হই। কেন আর ভাব—ভাবনার কি এই সময়।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন বাজে তখন কি আর ভাবনা থাকে—সৌজন্য ভদ্রতা কি আর রক্ষা করা যায়। ঐ দেখ রাখাল বালকেরা বাপ মা ঘর দ্বার ছাড়িয়া রাখালরাজের সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঘরের কাজ করিবার সময় হয় না—খাইবার পর্যন্তও সময় হয় না। ওরা কোন বাঁধন

মানে না—মানিবার প্রয়োজনও নাই—ওরা যে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়াছে—কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছে।

যখন ভাই—ঘরে আগুন লাগে তখন কি আর শান্ত শিষ্ট হইয়া বসিবার সময় থাকে—তখন কেবল এলোমেলো চাল—কেবল রোল কেবল গোল। তখন আর পুকুরের জল—কি নর্দমার জল—জ্ঞান থাকে না। কেবল—ঢালো ঢালো নিবাও নিবাও।

শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপতপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে—স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে—আমার প্রাণ সদাই আনচান।

এস তোমরাও এস—যদি মুক্ত হইতে চাও—যদি স্বাধীন হইতে চাও ত এস। পুরানো বাঁধন ছিঁড়িয়া এস—নূতন স্বরাজ-গড়ে আসিয়া নূতন তন্ত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও।

আর সংশয় করিও না—সন্দেহ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।

স্বদেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেম*

একদল লোক বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আঘাত পড়ে বলিয়া স্বরাজ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন। দেশভক্তির সঙ্গে বুঝি বা বিশ্বপ্রেমের একটা স্বাভাবিক বিরোধ দাঁড়াইয়া যায়, ইঁহাদের প্রাণে এই আশঙ্কাই অত্যন্ত বলবতী। ইঁহারা স্বদেশকে ভালবাসিতে চান, আন্তরিক ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু এই স্বজাতি-বাৎসল্য হইতে যখন আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে তখন এই প্রতিষ্ঠার ভিতরে দণ্ডকলহাদির সম্ভাবনা দেখিয়া ইঁহারা আপনার স্বদেশ-

* 'স্বরাজ' পত্রে ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত

ভক্তিকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন। ইঁহারা স্বরাজ চাহেন, কিন্তু এমনভাবে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে যাহাতে অন্য কাহারও স্বার্থের উপরে কোনো আঘাত না পড়ে। ইঁহারা বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারা অভিভূত রহিয়াছেন।

পররাষ্ট্র-সংঘর্ষ হইতে যে স্বরাজজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কোনো না কোনো আকারে পরকীয়া শক্তির পরাভব ব্যতিরেকে যে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে, এই সকল বৈষ্ণবভাবাক্রান্ত লোকে এই সহজ কথাটা ভাল করিয়া বোঝেন না।

আপনার জাতীয় উন্নতির সঙ্গে অপর কাহারো জাতীয় উন্নতির কোনো প্রকারের স্বাভাবিক বিরোধ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতেই সত্য। যদি প্রত্যেক জাতি নিজ বাসভূমে স্বাধীনভাবে আপনার লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়, তবে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সঙ্গে মাতৃমন্ত্র সাধনা সম্ভব হইতে পারে। মার্কিণে বা জাপানে, ইতালী কিংবা ফরাসী দেশে স্বজাতির উন্নতির সঙ্গে অপরাপর জাতির উন্নতির কোনো অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নাই। সেখানে নির্বিবাদে দেশভক্তির পরিতৃপ্তি করা সম্ভব ও সহজ। কিন্তু যে দেশে এরূপ স্বাধীনতা ও সম্ভাবনা নাই সেখানে পরকীয়া শক্তির পরাভব ব্যতিরেকে আত্মশক্তির প্রকাশ কখনো সাধ্যায়ত্ত নহে।

পরাধীন অবস্থা সহজ অবস্থা নহে, পরাধীনতার অবস্থা শান্তির অবস্থা নহে। ইহা সংগ্রামের অবস্থা। এইরূপ সংগ্রামের অবস্থায় প্রেমকেও আপাততঃ অপ্রেমের মধ্য দিয়াই আপনার চরিতার্থতা লাভ করিতে হয়। সহজ অবস্থার ব্যবস্থা ও ধর্ম অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য ও প্রামাণ্য হয় না। আমাদের বর্তমান অবস্থা সহজ অবস্থা নহে। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বজনীন মৈত্রীর প্রভাব অপরে বিনাশ করিয়াছে। মৈত্রী যেখানে মূলে নষ্ট হইয়াছে, সেখানে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। মৈত্রী নষ্ট করিয়াছে কে? ভিন্ন জাতির স্বার্থপরতা। প্রেমের দ্বারা এই জাতিগত স্বার্থপরতার পরাভব করা একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থবাসনাকে লাঞ্ছিত করিয়া পরাভূত করা যায় কিন্তু জাতীয় জীবনে এরূপ

ব্যবস্থা কখনই প্রযুক্ত হয় নাই, এবং ফলবতী হইবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থপরতা সমাজের উদার আদর্শের নিকটে আপনি নিয়ত সঙ্কুচিত হইয়া রহে। সাধারণ জনমণ্ডলীর স্বাভাবিকী পরার্থপরতা সতত ও সর্বত্র ব্যক্তি বিশেষের নিরঙ্কুশ স্বার্থবাসনাকে লজ্জা দিয়া থাকে। কোনো না কোনো আকারে, কিছু না কিছু পরিমাণে পরার্থপরতা ব্যতীত সমাজবন্ধন টিকিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের আদর আছে। সুতরাং সমাজ বিশেষের অন্তর্বর্তী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কল্যাণার্থ যেখানেই পরস্পরের স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সেখানেই জনমণ্ডলী তাহার সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও ভিন্ন জাতির স্বার্থের সঙ্গে যে অপর জাতির স্বার্থের একটা ঘনিষ্ট অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এ জ্ঞান আজি পর্যন্ত জন সমাজে পরিস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং যাঁহারা আপনার সমাজের মধ্যে সর্বত্যাগী হইয়া অপরের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারাই আবার সুযোগ পাইলে ও সামর্থ্য থাকিলে ভিন্ন জাতির সর্বস্ব হরণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। ক্লাইভ, ভেনসিটার্ট বা হলওয়েলকে ঠকাইয়া এক কপর্দকও লাভ করিতে হয় ত রাজি হইত না কিন্তু সেই ক্লাইভই জালিয়াত সাজিয়া ভিন্ন দেশীয় ভিন্নজাতীয় উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করিবার সময় কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইল না। এ জগতে কত মহানুভব বীরপুরুষ পরজাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া স্বজাতির ইতিহাসে অমরকীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যাহাকে লুণ্ঠন বলে রাজনীতিতে তাহারই নাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ইহার অর্থ এই যে চৌর্যাদি অপরাধ এবং পরদ্রব্য লুণ্ঠন—এ সকল এক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের পরস্পরের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বিভিন্ন সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এই সকল নৈতিক নিয়ম গ্রাহ্য হয় না।

গ্রাহ্য হওয়া উচিত—মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করি, এবং একদিন ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ সত্য ও ন্যায়ের এই সার্বজনীন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহা বিশ্বাস করি, কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনের নীতি দ্বারা রাষ্ট্রীয়নীতি পরিচালিত করা কেবল যে অসম্ভব তাহা নয়, অনুপযোগী বলিয়া একেবারে অবৈধ হইবে।

এই অবস্থায় আপাততঃ অপ্রেমের মধ্য দিয়াই প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রেমের অভিধানে কেবল কি পরেরই স্থান আছে, নিজের কোনো স্থান নাই? আমি যদি অপরের স্বার্থহানি করি তাহাতে অপ্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় মানি, কিন্তু অপরে যদি অন্যায়পূর্বক আমার যথাযথ স্বার্থের উপরে হস্তক্ষেপ করে তাহাতে কি অপ্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় না? অন্যায় যে করে সেই কেবল অপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করে না, আপনার উপরে অন্যায় অত্যাচারের যে প্রশ্রয় দান করে সে তদপেক্ষা আরও ব্যাপকভাবে অপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। আততায়ী স্বয়ং ত প্রেমকে হনন করেই, আততায়ীকে যে প্রতিরোধ না করে, সেও প্রেমের উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে। আততায়ীর প্রতি প্রেম পোষণ করা ক্বচিৎ কোন দেবচরিত্র পুরুষের পক্ষে সম্ভব। কুত্রাপি সাধারণ জনমণ্ডলী এখনও দেবচরিত্র লাভ করে নাই। তাহাদের পক্ষে আততায়ীকে হিংসা করাই স্বাভাবিক। আততায়ীর প্রতিরোধ না করিয়া যতদিন তাহারা এই অত্যাচার সহ্য করে ততদিন পর্যন্ত গোপনে গোপনে এই বিদ্বেষবহ্নিই তাহাদের প্রাণে জ্বলিতে থাকে। আততায়ীর অত্যাচারের প্রতিরোধ ব্যতীত তাহাদের অন্তরে প্রেমের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। অত্যাচার, অবিচার সর্বত্রই প্রেমের প্রতিরোধক। অত্যাচার, অবিচারকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া গাছের শিকড় কাটিয়া শীর্ষভাগে জলপ্রদানের ব্যবস্থার মত নিষ্ফল ও আত্মঘাতী।

অত্যাচার, অবিচার, পরাধীনতা প্রেমধর্মের মূল কাটিয়া দেয়। অত্যাচার, অবিচার, পরাধীনতার বিনাশে—অত্যাচারী, অবিচারী এবং অপরের অধীনতার উপরে যাহারা আপনাদের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের সকলের স্বার্থহানি হইয়া থাকে। এইরূপ স্বার্থহানি না করিয়া প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তীব্র সংগ্রামের ভিতর দিয়াই অত্যাচার, অবিচারের প্রতিরোধ হইয়া থাকে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ স্বার্থের আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে, সেখানে বিরোধ, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম, অশান্তি এই সকলের মধ্য দিয়াই বিলুপ্ত প্রেমধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হয়। ইহার আর অন্য উপায় নাই। এই কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন,

তাঁহারাই কেবল মাতৃভক্তির সঙ্গে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সন্ধি ও সমন্বয় স্থাপনে সমর্থ, তাঁহাদের নিকটে সংগ্রাম শান্তির সোপান, বিদ্বেষই প্রেমের পূর্ববৃত্ত সাধনা।

বাংলার বিশ্ব-কবি*

(ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়)

অনুবাদঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায়

[ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক *Sophia* পত্রিকায় (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০০) "The World-Poet of Bengal" নামে এক নাতিদীর্ঘ রচনা লেখেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার এমন অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি ইতিপূর্বে আর কারো লেখায় দেখা যায় নি। উপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' বলে অভিনন্দিত করেন। উপাধ্যায়ের রচনাটি এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে ছিল। রচনাটি মূল্যবান। *Sophia* পত্রিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এখানে *Sophia* পত্রিকা হ'তে উক্ত রচনাটি অনুবাদ করে দেওয়া হলো। – কালিদাস মুখোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও তিনি সদ্য বিকশিত চাঁপা ফুলের মতো যৌবনলাবণ্যে পরিপূর্ণ। তাঁর চিকন-কালো অলকদাম, পদ্মসদৃশ দু'টি চোখ, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগল, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকা, মরাল গ্রীবা, এবং তাঁর তপ্তকাঞ্চন বর্ণে দীপ্ত দীর্ঘ দেহ মহিমা, র‍্যাফেল অথবা এঞ্জেলোর ছবি আঁকবার উপযুক্ত বিষয় বলেই গণ্য হ'তে পারে।

* এই অনুবাদটি ২৮শে মে, ১৯৬১ সনের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর দেহ-লাবণ্যের থেকেও মহত্তর ও সুন্দরতর এবং অপরিমিতরূপে সমুন্নত। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তিনি যৌবনে কলকণ্ঠ ছোট পাখীর মতো মধুর স্বরে প্রেমের গান গেয়েছেন। তিনি শিশির-সিক্ত আকাশগামী বিহঙ্গের মতো প্রভাত-আলোর বন্যায় অভিষিক্ত হ'তে উর্ধ্বাকাশে উঠেছেন; চাতক পাখীর সঙ্গে তিনি উর্ধ্বমুখী হয়েছেন মেঘলোকে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্য। রজতশুভ্র চন্দ্র-কিরণে যখন পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যায়, তখন কবি চন্দ্রালোকে গিয়ে চাতকের সঙ্গে সুধা পান করেছেন। বিহঙ্গ-কূজনে প্রতিধ্বনিত গোলাপের কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন; তিনি স্রোতস্বতীর দীপ্তিময় নুড়িগুলি নিয়ে খেলা করেছেন; সূর্যের সোনালি কিরণ-জাল তার বুকে যে রামধনু-আঁকা ঘূর্ণি রচনা করে তাকে তিনি অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতির এমন কোন শোভা ও সৌন্দর্য নেই যার সঙ্গে না তিনি প্রণয়-ডোরে আবদ্ধ হয়েছেন এবং যাকে না তিনি তাঁর যৌবনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

গোলাপ-কুঞ্জের উৎসব সভায় কবি যোগদান করেছেন, কুমুদিনীর শয্যায় গা' এলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যেও কবি-মানসে দেখা গেছে একটা বিষণ্ণতার অনুভূতি। এই বেদনার অনুভূতি আনন্দের আতিশয্যকে করেছে সীমিত, স্থূল রূপানুভূতিকে করেছে সূক্ষ্মতর, তাঁর আবেগময়ী গীতি-কবিতাগুলির উদ্দীপনার প্রাবল্যকে ছায়াবৃত করে তাকে দিয়েছে অপরূপ সুষমা। তিনি গায়ক; তাঁর কণ্ঠস্বর মধ্যাকাশকে বিদীর্ণ করে দেয় ও আকাশের তোরণদ্বারে গিয়ে অভিঘাত রচনা করে, কিন্তু তারপর সে নীচে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে বেদনাহত কম্পমান অশ্রুজলের মতো। আত্মতৃপ্ত কোকিলের গানে নব শোভা ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত বনরাজি পরিপূর্ণ হয়ে যায়, আর ঘুঘু দূরে প্রিয়জনের কাছে বাণী পাঠায় গানের সুরে তার হৃদয়-ভার লাঘব করবার জন্য। এই ঘুঘুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করা সঙ্গত।

কবি-হৃদয়ের এই বিষণ্ণতা মানুষের আবেগকে চিত্রিত করতে কবিকে করেছে অসামান্য দক্ষ। তিনি পিতৃমাতৃহীনা বালিকার প্রতি সন্ন্যাসীর

প্রবল পিতৃস্নেহ নির্বাপিত করবার যে সংগ্রাম-কাহিনী এঁকেছেন, তা যে পাঠ করবে তার চোখ দিয়ে কি আতপ্ত অশ্রুজল গড়িয়ে পড়বে না? এক পৌরুষ-কঠিন কাবুলিওয়ালা এক নব-মুকুলিতা বাঙালী বালিকার অপার্থিব মাধুর্যের ধারায় করুণার বাণীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমন নিষ্করুণ কি কেউ আছে, যার হৃদয় এই কাহিনী পড়ে দয়ায় বিগলিত হবে না? যে কোন মানুষই টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়ম্" এবং শেলীর "এপিসাইকিডিয়ন" পরিত্যাগ করে কাবুলিওয়ালার অশান্ত বেদনা ও নিষ্ফল ভালবাসার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেম ও প্রকৃতির কবি নন—যাকে চোখে দেখা যায় না তাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। উপলব্ধির কথা বাদ দিলে, কাণ্ট, টেনিসন এবং নিউম্যান অ-রূপ জগতের সন্ধান পেয়েছেন বলে বলা হয়। লুপ্তগৌরবা বঙ্গভূমি আর একজনের জন্ম দিয়েছে এবং তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যখন যুবক—যখন আবেগ, উত্তাপ ও ভালবাসায় আমাদের হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ, তখন একদিন আমরা পড়ছিলুম কবির 'বিশ্বনৃত্য'। এই নৃত্যের তালে তালে চলতে গিয়ে আমরা অবশেষে নিজেদের হারিয়ে ফেললুম প্রেম ও সৌন্দর্যের কূলহীন মহাসাগরের মাঝে। বেদনাপূর্ণ বিভাগগুলি নিয়ে রচিত ক্লান্তিকর সময়কে মনে হলো বর্ণহীন মহাকালের বুকে বুদ্বুদের মতো। আমাদের ব্যক্তিসত্তা স্বাতন্ত্র্য হারালো এবং সকলের সঙ্গে এসে হলো যুক্ত। আমাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না। বিশ্বপ্রকৃতির সুর-সঙ্গতির আমরা হলাম অংশীদার। মধুমক্ষিকার মতো আমরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমরা মাতৃহৃদয়ের সুধা পান করেছি, ভালবাসার অমৃতভাণ্ড নিয়ে আমরা শিশুদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমরা উপলব্ধি করলাম আমরা নিজেদের নিয়ে শুধু বেঁচে থাকতে পারি না, আমরা বেঁচে আছি সকলকে নিয়ে। 'বিশ্বনৃত্য' শ্লথ হস্তে লেখা একটি ছোট কবিতামাত্র। কবি যখন বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের অথবা যে-প্রেম মানুষকে প্রায় দেবতার স্তরে

উন্নীত করে সেই প্রেমের গান করেন, তখন তিনি আমাদের অনন্তের অভিসারে প্রেরণ করেন। আকাশের প্রদীপ্ত সৌরমণ্ডল, পৃথিবীর মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষের বুদ্ধি ও প্রেম কবি-প্রতিভার সোনারকাঠির স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছে অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। এই সৌন্দর্য স্তব্ধ ও সমাহিত এই; সৌন্দর্য সমস্ত বস্তু সীমা অতিক্রম করে চলে গেছে দিগন্তহীন অঙ্গনে। বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ রহস্যময় অ-রূপ জগতের প্রত্যক্ষদর্শী।

বিদেশীরা যদি কোনদিন বাংলা ভাষা শেখে তা' হ'লে তারা তা শিখবে শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যই। তিনি একজন বিশ্ব-কবি। তিনি দেবদারু গাছের মতো, তার শিকরগুলি চলে গেছে মাটির নীচে অনেক, অনেক দূরে, কিন্তু আশঙ্কা হয় তার শীর্ষদেশ আকাশ বিদ্ধ করবে। এমনই তার সমুন্নতি। যে সব মহাজন অতৃপ্তি ও বেদনার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের রহস্যোদ্ধার করতে পেরেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন—তিনি তাঁদেরই সঙ্গে একাসনে বসবার অধিকারী।

*NAIVEDYA**

By

UPADHYAY BRAHMABANDHAB

The publication of *Naivedya* (lit. an offering) has unfolded a new potency of the Hindu mind. A collection of one hundred devotional sonnets, not tinged in the least with the bias of any of the prevailing religious schools in India, yet giving expression to the spirit of primitive, universal Theism in a pre-eminently Hindu way, is indeed a phenomenon in these days of shallow sectarianism and loose indifferentism.

* First published in *The Twentieth Century* in July, 1901.

Naivedya is religious poetry without being theology. Art loses its grace when encumbered with the logic-mill of argumentative apologetics. The "Paradise Lost" is perhaps unrivalled in its sublimity, but it is a gigantic failure so far as it is a justification of Puritanic theology. The "Divina Commedia" of Dante does not suffer under such disadvantage. Beatrice is the centre and soul of the poem. All the Christian doctrines about heaven, hell, purgatory, sin, grace, judgment, are embodied in it—but they have no coating of theology, no discoloring stamp of militant propagandism. The beauty and tenderness of Beatrice cast a halo over all things weaving them into a harmonious whole of maddening sweetness. The *Kumarasambhava* of Kalidas deals with gods and goddesses but its beauty has not been married because the denizens of heaven have been treated as creatures mundane. The poem may be considered heterodox but it touches the chord of human sympathy, *Naivedya* is a natural offering of the human heart to the Divine—an offering of joy and sorrow, of struggle and fruition, of all-embracing love, of national aspiration and desire for union with the Unrelated.

Though it is not theology, it is a mine of joy to theologians. There is not a single theological blunder in the whole collection. Its theism is sound to the core. In all places of worship, be they Christian, Muhamaddan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without the least scruple. They are the outpourings of a human heart and, as such, they belong to nature and universal reason.

It is not yet time perhaps to write a regular critique of the work. But a few analytical reflections on some of the sonnets may be helpful in the understanding of the great Idea of being united with the Infinite in and through the Infinite, which is the underlying essence of the poem.

Naivedya is considered by many as a new departure—a deviation from the usual course of the previous writings of the author. It is true that there was no obvious religiousness in them. But a closer study will make it clear that his poems throughout shew a struggle to break the bands of self and the

prison-door of relations, and be merged in the All. Even in the most painful outbursts of unrequited love we find the yearning after the Universal Good (*sivam*). Read—

শোনো বধুঁ শোন, আমি করুণারে ভালবাসি
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি।
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল
ভালবাসি বলে যেন কখনো কোরনা ভুল।
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি
তুমিত কেবল তার পাষাণ-প্রতিমা খানি।—

and see if it is not a passionate craving for the possession of the Invisible through the visible symbol.

Again in the "Dream-break of the Fountain" we find the following exquisite lines—

জগৎ দেখিতে হইব বাহির
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি—ঢালিব করুণা ধারা
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।—

pourtraying the impulse to live as a part of Nature and not apart. In the mystical poem on "Purnima" the rhapsodical effusion—

অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই, নিভে যাই
মরে যাই, অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

clearly indicates the ardent desire to be lost, as it were, in the Limitless Infinite.

I have quoted only the earlier writings. As the poet grew in wisdom the potential apprehension of the All-in-all became more and more actual till it blossomed luxuriantly in *Naivedya*. The following sonnet—

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি'
তোমার প্রাঙ্গনতলে,—ভরি ল'য়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে। আমি অন্যমনে
সঘন পল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণস্তীর্ণ তরঙ্গিণী তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে!
আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়!
আজি ভাবি ভাল হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল,—
হের তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি
অপরাহ্ণে ভরিলাম এ পূজার সাজি!—

discloses to us how gradually, unconsciously the poet has come to worship Nature's God through the love of nature.

In *Naivedya* we are not given a glimpse of the Infinite through theological sermons but through heart-stirring impulses, deep aspirations and an unaccountable though rational faith. In these days of contradictions it is hard for men to learn to appreciate invisible things through courses of theology. Their attention cannot be easily diverted to abstract themes from the theatre of actual life, of painful gropings after the True and the Good in the darkness of doubt and error and evil. But when a lofty soul, discovering the Real One through the galling encasement of the fleeting world-unreality, communicates his light to his

fellow-creatures, there is an easy response from the groaning hearts to the congenial stimulus. Such a witness of the Unseen is our poet of *Naivedya.* He sings—

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।
নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে,
চেতনা বেদনা ভাবনা আঘাতে,
কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি!
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি!
তব রাজত্ব লোক হতে লোকে,
সে বারতা আমি পেয়েছি পলকে
হৃদিমাঝে যবে হেরেছি তোমার
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি;বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

The keynote of the sonnets is the direct, personal relation with the Infinite. There are some who argue that as the Infinite is not easily approachable the finite should be worshipped tentatively by the less spiritually-advanced as the Infinite. Is the Infinite really unapproachable? If it had been so Reason would be an anomaly. The perception of the Infinite is the dawn of Reason. The commencement as well as the culmination of Reason is the Universal, Boundless Reality. To be rational is to apprehend the Infinite. The intellect of man cannot be illumined to know what is truth nor his heart inflamed to do what is good, without coming into personal contact with God's grace. The relation between man and God is too close to admit of any intervention. Nothing can come between me and my Maker.

This glorious privilege of standing direct in the presence of God is fully appreciated by the poet. To him it is the most precious of all rights. The first offering to God in *Naivedya* is the poet's self—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি জোড় কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে
ওগো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

Naivedya may be roughly said to embody four fundamental ideas; (1) Alone to the Alone; (2) God in humanity; (3) God as the moulder of the destinies of nations; (4) the all-inclusive God by Himself.

There come supreme moments in the lives of all spiritually-minded persons when the All-holy who lives alone (All-one) calls the human soul alone. The natural response to such a call has been expressed in the following lines with a solemn pathos which cannot but elevate the most dejected:—

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমারি নির্জনধামে! সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী,—সর্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্ব সঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হতে। দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্বযাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে!
দীপাবলী নিবাইয়া চলে যাবে যবে
নানাপথে নানাঘরে পূজকেরা সবে,

দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে ;—শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার।
একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া !

Notwithstanding this desire for lonely communion the poet does not look upon the world as coming in the way of the love of God and the realisation of His infinite majesty. He actually welcomes all to live with him and prays that his relation with them may lead to higher love and worship:—

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্
তারা ত পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে!
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।—

The poet goes further and deeper. He will not have even the joys of heaven if they are to be attained by disregard of all duties and responsibilities, by being apathetic towards human suffering. To partake of the sufferings of fellow-man is God-like, is to live the life of God on earth. What is innocent suffering but the suffering of God, as it were, in humanity? God does suffer in His love and compassion. To compassionate and help those who are suffering for the guilt of others, to lighten the burden of widows and phans, the weak and the oppressed, by sharing it, is to appeal to God to have mercy on fallen humanity. So the poet sings—

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরই সাথে দুঃখের ত্রাণ,

তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি!
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি!
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে!
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো, পবিত্র করে'
তোমার চরণ ধূলিতে!
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়োনা ভুলিতে!

Really the idea of quitting the world on the plea of asceticism while the actual motive is love of ease and comfort and avoidance of suffering, is very vicious. Rightly does the poet long to be saved through trouble and turmoil, pain and anguish. Though the Eternal Unity is the source of this temporal multiplicity, yet disharmony, strife and war have made victims of the children of the Supreme One, and the primeval unity cannot be restored unless the selfish, aggrandising humanity be encountered by self-sacrifice and innocent suffering and compassionate love. I hope the poet will, in due time, sing more of this sublime theme in his peculiar, enchanting strain and rouse up the hearts of our people from torpor to the sense of bearing one another's burden.

Of God as the moulder of the destines of nations there are a few sonnets which are really heroic. It is a very large subject and requires special consideration by itself. The poet does not look upon the Western civilisation as the basis of the future glory of India. The glamour of modern culture is to him but nocturnal

light and not the golden lustre of the dawn. His view has been beautifully set forth in the following:—

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার থালা
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর !
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

The poet's ideal is to build the national greatness of India on the pure, ancient Hindu foundation purged off its dross, though the superstructure may have a Western finish.

The crowning idea of *Naivedya* is to see God in God, Unrelated, Absolute, divorced from all relations. Who does not see in the sonnet—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম ! তবু শুধু মাধুর্য মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয় !
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়,
বিচিত্র সৌন্দর্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কত রূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে ! চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিবনাক সন্তোষের ডোর !
আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে,—সেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার !
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে !—

the ancient Vedantic aspiration of attaining to *Niralamba Brahmajnan* (knowledge of God as He exists in Himself)? Man

knows Him through relations as the great Related One, but His bliss beatific does not consist in his correspondence with creatures but in the colloquy of His depthless profundity with His boundless expanse where all varieties are merged into an incomprehensible, synthetic unity. India has lost this aspiration and hence is her fall. The poet has sung again the old song of the Upanishads in a new strain and let it rise as a cry of our people to heaven, as a memorial for Divine grace. Let us then sing with the poet—

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীমা মাঝে পূর্ণানন্দ ভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর!

In *Naivedya* though we do not find any pre-vision of the immortal society which is being formed in heaven, where union of kindred hearts will be consummated in perfection, the idea that death is but a step to the knowledge of the Unknown is very forcibly expressed:—

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর! আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে!
সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছলছলি'
জীবন আঁকড়ি' ধরি আপনার বলি'
দুই ভুজে! ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মত! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়!

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে !

Within the compass of one hundred sonnets it cannot be expressed that the great Idea of union with the Infinite can be treated exhaustively. We get glimpses of the Immortal Life through the transparent heart of the poet, but they only intensify our desire to see more and more.

In spite of the exuberance of rational light and wisdom the poet is oppressed with the sense of a void, an aridity, which moves him to raise his bewailing voice to the merciful heaven:—

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম ! দিক্‌-চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাহি কোনখানে
সরল সজল রেখা. কেহ নাহি আনে
নব বারি-বর্ষণের শ্যামল সংবাদ !
যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আন বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে !
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র করাঘাতে
সচকিত কর মোর দিক্‌ দিগন্তর !
সংহর সংহর, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ,
নিঃসহ নৈরাশ্য তাপ ! চাহ নাথ চাহ
জননী যেমন চাহে সজল নয়নে,
পিতার ক্রোধের দিনে, সন্তানের পানে !

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্বপানে চাহি' ! ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্‌ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখার চক্ষের নিমিষে

কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তরে !
গম্ভীর মাভৈঃ মন্ত্র কোথা হতে বহে'
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘন সমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি' নিবিড়চ্ছায়ায় !
তার পরে বিপুল বর্ষণ ! তার পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্য রবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজা-পুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি' !

How pathetic, how deep, how sincere is the prayer! It softens the hardest heart and shows the nothingness of man.

Naivedya is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace. May the poet's prayer—

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো !
সব দুখশোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো !
কোণে কোণে যত লুকান আঁধার
মরুক্ ধন্য হয়ে
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো !
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
পরশ মণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক্ পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!
আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো!
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!

be fulfilled and may he partake more abundantly of the light of the Divine Countenance!

A NATIONALIST'S END*

By

SHYAM SUNDAR CHAKRAVARTY

In that most dramatic and miraculous march of events which mark the progress of the nationalist movement in India, the closing of the earthly career of Upadhyay Brahmabandhab, the brave and renowned editor of *Sandhya,* in the Campbell Medical Hospital on Sunday morning strikes the imagination in a peculiarly powerful way. His was a personality which of late came to be discussed under every roof of Bengal for the inspired and forceful statement he had made when placed on a charge of sedition before a servant of the bureaucracy. He told him to his face that he owed no responsibility to an alien bureaucracy

* First published in *Bande Mataram* on Oct. 28, 1907. According to Sj Hemendra Prasad Ghose the article was contributed by Shyam Sundar Chakravarty of the *Bande Mataram* editorial staff,

for preaching the God-appointed mission of Swaraj. The statement might have appeared quixotic to many. To the eye of Faith and Hope, however, the future stands self-revealed. The man of faith speaks uncommon things—he speaks strange truths—for he is a prophet. He knows the will of Providence as Whose instrument he works. The messengers of Liberty have a despot-defying strength which knows no compromise—knows no defeat. All who work in the train of despotism, hangman, priest, tax-gatherer, soldier, lawyer, lord, jailor, and sycophant try to rivet their iron chains on the Messiah of human emancipation, but he eludes their grasp and travels to spheres where kings have little power. The passing away of Upadhyay Brahmabandhab when the bureaucracy was pursuing him with the most unedifying vindictiveness, proves beyond the shadow of a doubt that when the infidel supposes that he can very well triumph with the prison, scaffold, garrotte, handcuffs, iron necklace and lead balls at his command, Faith twists him with his audacity and takes his victim far out of his reach.

Upadhyay Brahmabandhab was undergoing an operation in the Hospital. The news was communicated to the Magistrate and the public prosecutor nevertheless demanded his presence in the court and what is more the bureaucracy brought against him a second charge of sedition, cancelled the previous bail bond and threatened to hurry him into the jail as soon as he would be pronounced fit to be discharged from the Hospital. Providence could no longer withhold His interference. The patient whose condition after the operation inspired hopes in the breasts of his friends and admirers showed signs of sudden collapse and his end is still veiled in mystery to those who are now mourning his loss. The circumstances attending his passing away are pathetic in the extreme. Since the institution of the *Sandhya* prosecution he became very much concerned about the release of that young patriotic co-worker, who according to the latest freak of the bureaucratic law was hauled up along with him as the manager of the alleged seditious print. When the second *Sandhya* prosecution came on, the editor was in the Hospital and the full brunt

of the bureaucratic wrath fell on this young man who was assured by the Police when the search was going on that they had no warrant against him but was afterwards asked to accompany them and when they got him into the *ghary* he was arrested. The boy was refused bail, had no food during the whole day and was very inconsiderately treated. When these details of the courageous young man's arrest and ill-treatment were a little thoughtlessly made known to him, he burst into tears and requested earnestly all the visitors who saw him since to do their utmost to secure only just treatment for this brave and patriotic young man. His anxiety deepened as time passed on and the last word he uttered was the name of this young man, as the admirers who watched him in his death-bed told us with tears in their eyes. We need not dwell on the aching close of this devoted patriot's life. We draw a veil over the sad incident which marked his end and pass on to the triumph of liberty and nationalism which his passing away so unmistakably proclaims. The funeral scenes open a unique chapter in the history of our country. The end of this Bengali Nationalist even monarchs can envy. His end could not be made known in time but the procession was notwithstanding unexpectedly large. A full-keyed music flooded all the channels of the city streets along with chocked voices and tears. Every street, every lane, every house contributed its quota of admirers as the procession proceeded along and when the last resting place was reached the concourse of people baffled all calculation. There was only hustling and elbowing with befitting solemnity and seriousness to have a last look at the face which though smitten by the hand of Death radiated the serenity, calmness and courage which characterised the dear departed in life. One could not perceive till then what invincible forces the Hindu *Sannyasi* Upadhyay Brahmabandhab had set at work. Intense patriotism was written on every face. The defiance he hurled at the bureaucracy was the talk on every lip. The partiality of Providence for the genuine divine messenger of Liberty was the only moral that began to be involuntarily discussed. The funeral scenes had a pathos and grandeur which will not soon be

forgotten. There were loud and persistent demands to have the crowd in front seated so that all might command a last view of the great man who had done so much to infuse this new life into the country. Every one present became extremely restive and anxious to treasure a relic of the illustrious deceased and the flowers that had been strewn upon him were then distributed amongst the assembled crowd who pressed their appeals in such a piteous tone that refusal was out of question. And, lastly, when a few disconsolate ladies waded through the crowd like appartitions and touched the sacred tenement of that great soul, the whole crowd was overcome by feelings which were never experienced before. The brief funeral speech of the more elderly among them had an unspeakable eloquence. It moved the whole crowd to tears. She referred to the part he had played in arousing Indian womanhood. The graceful political references unobtrusively introduced struck a chord in every bosom and when she mourned his loss along with the prosecution of Sj. Bepin Ch. Pal and Upadhyay's beloved Sriman Saroda Charan there was loud sobbing and weeping all through the crowd. Yesterday witnessed a scene which makes our heart beat with high hopes. Liberty! let others despair of thee, we do not. And if anything was necessary to overcome our scepticism the sublime close of this great indomitable Nationalist, invincible both in life and in death, furnished that one supreme logic about the ultimate triumph of freedom.